# রাঙাবৌদি

নিমাই ভট্টাচার্য

# রাঙা-বৌদি

নিমাই ভট্টাচার্য

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৮ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪
ব্লক
মডার্ন প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীপঙ্কজকুমার দোলুই
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩।

—ওহে শুনছ? তোমার গুণধর পালোয়ান পুত্র এসেছেন। ওকে ভাল করে খেতে দাও।

বাড়ির মধ্যে আমাকে পা দিতে দেখেই বারান্দা থেকে বাবা চিৎকার করে কথাগুলো মাকে বলেন।

শুধু আজ নয়, প্রতিদিন সকালে আমাকে দেখেই বাবা এইভাবে টিটকিরি দেন। বাবার কথা শুনে মন খারাপ হয়, কখনও কখনও রাগও হয় কিন্তু টুঁ শব্দ করি না। নিঃশব্দে মাথা নীচু করে ঘরে যাই।

আমার অপরাধ অনেক।

প্রথমতঃ আমি ব্যায়াম করি। ছ' সাত বছর বয়স থেকেই আমাদের কলোনীর সর্বজনপ্রিয় বড়দার কথা মত ব্যায়াম করি। বড়দা আমাদের বলেছেন, শরীর হচ্ছে মনের আধার। তাই তো শরীরকে সুস্থ সবল না রাখলে মন ভাল থাকতে পারে না। আবার শরীর ও মন ভাল না থাকলে কেউই কোন কাজ ভালভাবে করতে পারে না।

শুধু কথা শুনে না, বড়দাকে দেখেও অনুপ্রেরণা পাই। এখন তো বড়দার বয়স প্রায় ষাট হবে কিন্তু যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমনই মুখে হাসি। কোন কাজে না বলতে জানেন না, ফাঁকি দিতেও পারেন না। চাকরি করেন চব্বিশ-পরগণা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে। যত জল-ঝড় হোক বা ট্রাফিক জ্যাম, পথ অবরোধই থাক, বড়দা দশটা বাজার দু'পাঁচ মিনিট আগেই ঠিক অফিসে পৌঁছে যাবেন। টিফিনের সময় আধ ঘণ্টার জন্য বাইরে যাওয়া ছাড়া বড়দা কখনই পাঁচ মিনিটের জন্যও বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান না।

বড়দাকে আমরা শ্রদ্ধা করি আরো একটা বিশেষ কারণে : সে তাঁর মাতৃভক্তি! আমাদের কলোনীর অতি বৃদ্ধরা বলেন, ও হচ্ছে এ যুগের বিদ্যাসাগর! এমন মাতৃভক্তি আর দেখা যায় না।

বড়দার কথা মত ঠিক পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠি। প্রথম প্রথম অত ভোরে ঘুম ভাঙতো না। দিদি আমার গায়-মাথায় হাত বুলিয়ে আমার কানের কাছে বার বার

বলতো, পাপাই, উঠে পড় ভাই। তুই ক্লাবে যাবি না? ব্যায়াম করবি না?

আমি বিছানায় উঠে বসলেই দিদি আমাকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলতো, পাপাই আমার সোনা ভাই!

দু' এক মাস দিদি ঐভাবে আমার ঘুম ভাঙালেও তারপর থেকে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই ঠিক আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তাম। দিদি আমার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হেসে বলতো, ভেরি গুড বয়!

পুরো এক ঘণ্টা ব্যায়াম করে এসে সত্যি আমার খুব খিদে পায়। আমি হাত-মুখ-পা ধুয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে যেতেই ছোট পিসী ডান হাত তুলে আমাকে ডাক দেয়। আমি ওর কাছাকাছি যেতেই একটা গেলাস এগিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলে, চট করে এটা গলায় ঢেলে দে।

কোনদিন একটু দুধ, কোনদিন আবার কোন সরবতের গেলাস আমার হাতে তুলে দিয়েই ছোট পিসী আপনমনে বলে, ছেলেটা যে শান্তিতে খাবে, তারও উপায় নেই।

এর পরই ছোট পিসী এক একটা করে পাঁচটা-ছ'টা গরম গরম রুটি আমার থালায় দিতেই আমি কুমড়োর তরকারী দিয়ে চটপট খেয়ে নিই।

আমাদের বাড়ির নিয়ম সকালবেলার জলখাবার হচ্ছে আটার রুটি ; তবে প্রত্যেকের বরাদ্দ হচ্ছে দুটি রুটি। শুধু আমিই পাঁচ-ছ'টা রুটি খাই। তবে তার জন্য মা, পিসী আর দিদিকে অনেক ছলচাতুরী করতে হয়। দিদি সন্ধের পর পাশাপাশি তিনটে কলোনীতে তিনটে টিউশানী সেরে বাড়ি ফেরার পথে অপরিচিত কোন দোকান থেকে নগদ পয়সায় এক-আধ সের আটা কিনে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে আনার পর মা সে আটা লুকিয়ে রাখেন। বাবা রেশনের বরাদ্দ চাল-আটা দিয়েই সংসার চালাবার হুকুম দিয়েছেন বলেই এত কাণ্ড করে দিদিকে অতিরিক্ত চাল-আটা কিনতে হয়।

কদাচিৎ কখনও বাবা দেখতে পেলেই গর্জে ওঠেন, দশজনে খরচ করলে কি সংসারে কোন শৃঙ্খলা থাকে? আমাকে টাকা না দিয়ে এভাবে খরচ করার কোন মানে হয়?

মা বা দিদি একটি শব্দ উচ্চারণ করেন না কিন্তু বাবা বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছোট পিসী চুপ করে থাকে না। বলে, দেখো দাদা, শুধু রেশনের চাল-আটায় যদি সংসার চলতো তাহলে আর খুকীকে এভাবে কেনাকাটা করতে হতো না। ছেলে মেয়েরা আর কচি বাচ্চা নেই। বৌদি মা হয়ে কিভাবে ওদের আধপেটা খাইয়ে রাখবে, বলতে পারো?

না, শুধু এইটুকু বলেই ছোট পিসী থামে না।

—তোমার এই মেয়েলীপনা আর খিটখিটে স্বভাবের জন্যই সংসারে এত অশান্তি, কারুর মুখে হাসি নেই। চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ির মধ্যে বসে বসে বৌদি আর ছেলেমেয়েদের উপর গোয়েন্দাগিরি না করে কোথাও গিয়ে তাস-পাশা খেলতে পারো না? কালীতলায় আড্ডা দিতে পারো না?

আমরা তিন ভাইবোন রান্নাঘরে মা-র পাশে বসে ছোট পিসীর কথা শুনে মুখ টিপে হাসি। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে মা-ও হাসেন।

বাবা টুঁ শব্দ না করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকেন।

তারপর ছোট পিসী বিজয়ী বীরের মত রান্নাঘরে ঢুকতেই আমি আর ছোড়দি ওর গলা জড়িয়ে ধরি। দিদি হ্যান্ডসেক করে মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলে, কনগ্রাচুলেশনস্!

ছোট পিসী একটা পিড়ি টেনে নিয়ে বসতেই মা চাপা হাসি হেসে বলে, ছোট ঠাকুরঝি, শুধু তুমিই পারো তোমার দাদাকে মুখের উপর উচিত কথা শুনিয়ে দিতে। আমাদের তো কারুর সাহস হবে না কিছু বলতে।

—দাদাকে আমি ভয়ও করি, ভক্তিও করি কিন্তু সহ্যের তো একটা সীমা আছে। দিন-রাত্তির যদি কেউ টিকা-টিপ্পনী আর খোঁচা দিয়ে কথা বলে, তাহলে কত সহ্য করব?

ছোট পিসী একবার নিঃশ্বাস নিয়েই মাকে বলে, তুমি সব সময় সবকিছু সহ্য করে আর চুপ করে থেকে দাদাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছ।

মা অসহায়ার মত বলে, কি করব বলো? কারুর সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করতে পারি না।

—তাই বলে কি সারাজীবনই অন্যায় সহ্য করবে?

আমাদের আদি দেশ বাংলাদেশের যশোর জেলায় হলেও ঠাকুর্দা থাকতেন ঘুঘুডাঙ্গায়—আজকের দমদমে। দমদম বাজারেই ওর শাড়ির দোকান ছিল। বড় পিসীর জন্ম যশোরে হলেও বাবা আর ছোট পিসীর জন্ম দমদমেই। বড় পিসীর বিয়ে হয় ফরিদপুরের মাদারী হাটে। বড় পিসেমশাইদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল রেডিমেড জামা কাপড়ের। আমাদের তিন ভাইবোনের জন্মের অনেক আগেই বড় পিসেমশাই যক্ষ্মায় মারা যান। আমার ঠাকুর্দা যখন মারা যান, তখন মা-বাবার বিয়েও হয়নি। বাবাই ছোট পিসীর বিয়ে দেন। ছোট পিসেমশাই ছিলেন পোস্ট অফিসের কেরানী ; উনি বিয়ের দু'বছর পরই বাস দুর্ঘটনায় মারা যান। ছোট পিসীর বয়স

তখন ঠিক সতের। বিধবা হবার পর পরই ছোট পিসীকে বাবা নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তখন বাবার বিয়ে না হলেও ঠাকুমা বেঁচে ছিলেন।

ছোট পিসী বিধবা হলেও নিঃসম্বল হলো না। ছোট পিসেমশাই পোস্ট অফিসে জমিয়েছিলেন প্রায় একুশ' হাজার টাকা। এছাড়া ছোট পিসীর শ্বশুরমশাই তাঁর অর্ধেক জমি বিক্রি করে তেইশ হাজার টাকা বিধবা ছোট পুত্রবধূর নামে পোস্ট অফিসে জমা করেন। এছাড়া ঐ পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ দু'চার মাস অন্তরই দু' এক মন জমির চাল আর কিছু নগদ টাকাও পাঠিয়ে দিতেন ছোট পিসীকে। এর উপর উনি ওর স্ত্রীর অর্ধেক গহনাও বিধবা পুত্রবধূকে দেন। ছোট পিসী নিজের ও শাশুড়ীর সব গহনা রেখে দিয়েছেন আমাদের তিন ভাইবোনের বিয়ের জন্য। পোস্ট অফিসে জমানো টাকার শুধু সুদের টাকা নেওয়া ছাড়া ছোট পিসী কদাচিৎ কখনও দু' পাঁচশ টাকা তুলেছেন। যক্ষের ধনের মত টাকাগুলোও জমিয়ে রেখেছেন আমাদের তিন ভাইবোনের বিয়েতে খরচ করবেন বলে।

ছোড়দি মাঝে মাঝেই ঠাট্টা করে ছোট পিসীকে বলে, আমি লাভ ম্যারেজ করলেও তুমি তোমার টাকার তিন ভাগের এক ভাগ খরচ করবে তো?

—যদি ছোকরাটাকে আমার, তোর মা-র আর দিদির পছন্দ হয়, তাহলেই খরচ করব। আর যদি দেখি একটা বাঁদর ছেলের গলায় মালা পরাতে চাস, তাহলে একটা পয়সাও খরচ করব না।

ছোট পিসী সাফ জবাব দেন।

ছোট পিসী আর মা'র মধ্যে অভাবনীয় বন্ধুত্ব। ছোট পিসী বিয়ের পর যে দু'বছর কাটোয়ায় শ্বশুরবাড়ি ছিলেন, তখন ঠিক পাশের বাড়ির সাবিত্রীই ছিল তাঁর একমাত্র বন্ধু। উনি বিধবা হয়ে দাদার সংসারে আসার দেড় বছর পরই সাবিত্রীর সঙ্গেই দাদার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বিয়ের আগে মা ছোট পিসীকে বলতেন বৌদি ; বিয়ের পর মা হলেন বৌদি আর ছোট পিসী হলেন ছোট ঠাকুরঝি। আমাদের তিন ভাইবোনকে মা পেটে ধরলেও অতি শৈশব থেকেই আমরা থেকেছি ছোট পিসীর কাছে। আমাদের সুখ-দুঃখ আদর-আবদার সবকিছু ব্যাপারেই ছোট পিসী। আমাদের কারুর সামান্য একটু সর্দি-কাশি বা জ্বর হলে আর কথা নেই। কিভাবে যে সেবা করবেন আর কত ভাবে যে সামলে রাখবেন, তা আর উনি ভেবে পান না। তাছাড়া কালীতলার কালীর কাছে মানত করা আছেই।

মা দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে ঘণ্টা খানেকের দিবানিদ্রা দেবার আগে কোন না কোন বই পড়বেনই। ছোট পিসী দিবানিদ্রা দেন না ; সে সময় উনি সেলাই করবেন। মা-দিদি-ছোড়দির সব ব্লাউজই ওর হাতে তৈরি।

আমার মা আশ্চর্য মহিলা। বাবা তাঁকে কোনদিন শান্তিতে থাকতে দেননি ; সুযোগ দেননি কোন সখ-আনন্দের। মা গল্প-উপন্যাস এত ভালবাসলেও বাবা তাঁকে কোনদিন একটা বই উপহার দেওয়া তো দূরের কথা আমাদের কলোনীর বিবেকানন্দ পাঠাগারের সদস্যাও করেননি। দিদি প্রথম টিউশানীর প্রথম মাসের মাইনে দিয়ে মাকে বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' উপহার দেয়। এখন তো দু'এক মাস অন্তরই দিদি মাকে কোন না কোন বই কিনে দেয়। মাকে প্রতিবছর দুটো পূজা সংখ্যা উপহার দেয় বড় পিসীর ছেলে আমাদের রাঙাদা। তাছাড়া মা অভাবনীয় সহনশীলা। কখনই কোন দুঃখ-আক্ষেপ বাদ-প্রতিবাদ করেন না। দিদি তো মাকে বলে, তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল ধরিত্রী। ছোট পিসী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ঠিক বলেছিস।

বাবার বিন্দুমাত্র মত না থাকলেও দিদি বি. এ. পাশ করেছে ; টিউশানী করছে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দেবার পর থেকেই। দিদি মায়ের মতই সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী। দুটো চোখ থেকে যেন স্নেহ-ভালবাসা ঝরে পড়ছে। দিদি অতি সাধারণ একটা তাঁতের শাড়ি পরে আঁচলটা টেনে নেয় গায়ের উপর। বাঁ হাতে এইচ-এম-টি'র একটা ঘড়ি, ডান হাতে দু'গাছা ব্রোনজ্-এর চুড়ি, মাথায় বিরাট খোপা, কপালে একটা বড় টিপ। পাউডারের সামান্য পাফটাও মুখে বুলায় না কিন্তু তাহলে কি হবে? এমন স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী যখন তখন পথেঘাটেও বিশেষ চোখে পড়বে না। সব সময় ঠোঁটের কোণে একটু যেন হাসি। স্কুলে বা টিউশানী করতে যাবার সময় কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে যখন দিদি বেরোয়, তখন আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি।

সংসারে কার কখন কি দরকার, তা অন্য কেউ জানার আগেই দিদি জানতে পারে। সকালবেলায় স্কুলে যাবার সময় দিদি একটা নতুন লুঙ্গি বাবার সামনে রেখে বলে, আজ চান করার পর তুমি এই লুঙ্গিটা পরবে। আমি সেলাই করার পর ধুয়ে কেচে দিয়েছি। নীল লুঙ্গিটা আর ব্যবহার করবে না।

বাবা অবাক হয়ে বলেন, ও লুঙ্গিটা তো ভালই আছে। তুই অযথা টাকা খরচ...

দিদি বাবাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই একবার হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়েই বলে, আমি বেরুচ্ছি। যা বললাম মনে থাকে যেন।

দিদি বেরুবার সময় মা আর ছোট পিসী বারান্দায় এসে দাঁড়ান। বাবাকে নতুন লুঙ্গি দেওয়া দেখেই মা আপনমনেই বলেন, গত বুধবারই খুকী আমার জন্য দুটো ব্লাউজের কাপড় আনলো। আজ আবার ওর বাবাকে নতুন লুঙ্গি দিল। মেয়েটা যে কিভাবে কি করছে তা আর ভেবে পাই না।

ছোট পিসী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, খুকী ধারও করবে না, আবার কারুর কাছে হাতও পাতবে না। ও সে ধরনের মেয়েই না।

সিনেমা-থিয়েটার দেখার বাতিক নেই দিদির ; তবে ভাল শিল্পীর গান শুনতে খুব ভালবাসে। দিদি নিজেও খুব ভাল গাইতে পারে। গান শিখেছে স্কুলে পড়ার সময় মিউজিক টিচার বনানীদির কাছে। দিদি ছিলেন ওর প্রিয় ছাত্রী। শুধু স্কুলের সব ফাংশানেই না, আগে আমাদের কলোনীর সব অনুষ্ঠানেও দিদি গান গাইতো। দিদির খুব ইচ্ছা ছিল সুমিত্রা সেনের কাছে গান শেখা কিন্তু অন্য অনেক কিছুর মতই দিদির সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। এখন দিদি কদাচিৎ কখনও গান গায় মা, ছোট পিসী বা আমার অনুরোধে।

এইতো গত রবিবারের কথা। সন্ধের পর মা-ছোট পিসী আর আমরা তিন ভাইবোনে মিলে গল্পগুজব করছিলাম। হঠাৎ মা বললেন, হ্যাঁরে খুকী, ক'দিন ধরেই তোকে জিজ্ঞেস করব করব করেও ভুলে যাচ্ছি। 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত'—এর পরের লাইনটা কীরে?

দিদি মুহূর্তের জন্য চোখ বুজেই গেয়ে ওঠে—

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মতো...

গান শেষ হতেই মা বলেন, খুকী, সত্যি তোর গান শুনলে মন ভরে যায়।

ছোড়দি বলে, দিদি, একটা গানের কথা বলব?

—না, না, আমি আর পারছি না। গান গাইতে হাঁপিয়ে উঠি।

হঠাৎ ছোট পিসী বলেন. আচ্ছা খুকী, সই সই বলে তুই মাঝে মাঝে কি যেন একটা গান...

ওনার কথা শেষ হবার আগেই দিদি হাসতে-হাসতে গেয়ে ওঠে—

ওলো সই, ওলো সই
আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই।
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি কোণে বসে কানাকানি
কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই।...

দিদি গান থামিয়ে বলে, ছোট পিসী, এই গানের কথা বলছিলে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই গানের কথাই বলছিলাম। শোনা তো পুরো গানটা।

দিদি আবার শুরু করে—

ওলো সই, ওলো সই
তোদের আছে মনের কথা, আমার আছে কই।

আমি কী বলিব, কার কথা, কোন্ সুখ, কোন ব্যথা—

নাই কথা, তবু সাধ শত কথা কই।।...

দিদি গান শেষ করতেই ছোট পিসী বলেন, এই গানটা আমার খুব ভাল লাগে।

ছোড়দি বলে, ইস! আমি যদি এইরকম গাইতে পারতাম!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, যে মেয়ে দিনের মধ্যে ছ'ঘণ্টা-আট ঘণ্টা আয়নার সামনে রূপচর্চা করে, তার দ্বারা আর গান হয় না।

ছোড়দি গর্জে ওঠে, তুই চুপ কর। আমি গান গাইতে পারি বা না পারি, তা তোকে দেখতে হবে না। ব্যায়াম করা ছাড়া তোর তো আর কোন কাজ নেই। ভবিষ্যতে তোর দ্বারা শুধু দারোয়ানী হবে ; আর কিছু তোর দ্বারা হবে না।

—তুই আমাব ভূত-ভবিষ্যৎ সব জেনে গেছিস, তাই না?

দিদি বলে, আঃ! কি হচ্ছে!

হাজাব হোক আমরা কলোনীতে বাস করি। বহু পরিবারের সঙ্গেই আমাদের চেনা-জানা ওঠা-বসা। আমরা যেমন অনেকের বাড়িতে যাই, আবার ওরাও আমাদের বাড়ি আসেন। কলোনীর প্রায় সবাই দিদিকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন। দিদির সঙ্গেও কলোনীর অনেক বউ আর ছেলেমেয়ের বন্ধুত্ব। আমার বন্ধুরা তো দিদির হনুমান ভক্ত। অনেক ছেলেমেয়েই কারণে অকারণে দিদির কাছে আসে। দিদি তাদের সবার সঙ্গেই গল্পগুজব করে ; কখনও কখনও হাসিঠাট্টাও হয়। ও কাউকে দূরেও সরিয়ে রাখে না, খুব ঘনিষ্ঠও হয় না। তবে আমরা সবাই জানি দিদি আর বুবুনদার মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব।

বুবুনদারা ঠিক আমাদের সামনের বাড়িতে থাকে। ওর বাবা অধীর চৌধুরী ছিলেন নাকতলা হাই স্কুলের হেডমাস্টার। এই অঞ্চলের সবাই ওকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। আমাদের মা-বাবা-ছোট পিসী ওকে দাদা বলতেন ; আমরা বলতাম ভাল জেঠু। উনি দিদিকে অসম্ভব স্নেহ করতেন ; ডাকতেন 'ভাল মা' বলে। তাইতো বুবুনদার ছোট দুই বোনই দিদিকে ভালদি বলে। কলোনীর কেউই দিদিকে লোপামুদ্রা বলে ডাকে না ; সবাই বলে খুকী বা খুকীদি। শুধু বুবুনদা দিদিকে ডাকে লোপা বলে। বুবুনদাদের ছোটবেলাতেই ওদের মা মারা গিয়েছেন। ওদের সংসার সামলান দূর সম্পর্কের এক নিঃসম্বল বিধবা মাসী। বুবুনদা ইকনমিক্স নিয়ে এম. এ. পাশ করেই স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার হয়েছে। উনি চাকরি পাবার তিন মাসের মধ্যেই ভাল জেঠুর মৃত্যু হয় ঘুমের মধ্যে। ভাল জেঠুর মৃত্যুর পর বুবুনদা ভীষণ ভেঙে পড়ে। শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার পরও ব্যাঙ্কে যেত না, খাওয়া-দাওয়াও করতে চাইতো

না। দিদি রাত্তির বেলায় টিউশানী সেরে বাড়ি ফিরতেই মা বলতেন, খুকী, তুই আগে বুবুনকে দেখে আয় তো। দিনের বেলায় ছেলেটা শুধু ডাল-ভাজা দিয়ে কয়েক মুঠো ভাত খেয়েছে। তুই বললে ও ঠিক খেয়ে নেবে।

হ্যাঁ, সত্যি বুবুনদা কোনকালেই দিদির কোন অনুরোধ ফেলতে পারে না। আবার আমরা দেখেছি বুবুনদার কোন কথাই দিদি ফেলতে পারে না।...

বুবুনদাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেই বাবা এক গাল হেসে বলেন, এসো, বুবুন, এসো।

উনি বারান্দার কাছাকাছি আসতেই বাবা প্রশ্ন করেন, তুমি কী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়েছ?

বুবুনদা একটু হেসে বলে, না, নতুন কাকু, এখনও হইনি। আরো বছর দুয়েক পরে হবো।

—তুমি কী এখনও বেহালা ব্রাঞ্চে আছো?

—আমি এখন পার্ক সার্কাস ব্রাঞ্চে আছি।

বুবুনদার গলা শুনেই ছোট পিসী ঘর থেকে বারান্দায় এসেই বলেন, অর্পণ বাবা, ক'দিন দেখিনি কেন?

ও কথার জবাব না দিয়ে বুবুনদা একটু হেসে বলে, আপনি ছাড়া কলোনীর কেউই আমাকে অর্পণ বলে ডাকে না।

—এমন সুন্দর ছেলের এমন সুন্দর নাম থাকতে বুবুন বলব কোন দুঃখে।

রান্নাঘর থেকেই মা গলা চড়িয়ে বলেন, বুবুন, রান্নাঘরে এসো।

—আসছি ভাল কাকিমা।

বুবুনদা রান্নাঘরে পা দিয়েই বলে, ভাল কাকিমা, লোপা কি বাথরুমে?

—ও তো এখনও স্কুল থেকেই ফেরেনি।

—তাই নাকি?

—বোধহয় স্কুলে কোন কাজে আটকে পড়েছে; তা নয়তো এত দেরি তো করে না।

রান্নাঘরে বসে চা-টা খেতে খেতেই বুবুনদা মা আর ছোট পিসীর সঙ্গে কথা বলে। দু' পাঁচ মিনিট পরই দিদি এসে হাজির। দিদিকে দেখেই বুবুনদা জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার লোপা? এত দেরি হলো?

দিদি একটা পিড়ি টেনে নিয়ে ওর পাশে বসেই একটু হেসে বলে, একটা মিনিবাস একটা অটোকে ধাক্কা দিয়েছে। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা অবরোধ।

—চমৎকার!

দিদি ওর দিকে তাকিয়ে একটু চাপা হাসি হেসে বলে, তোমার কী ব্যাপার? হঠাৎ এই অসময়?

বুবুনদা পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজ বের করে দিদির হাতে দিয়ে বলে, কাল রবীন্দ্র সদনে সুমিত্রা সেনের একক সঙ্গীত। তাই দুটো টিকিট কেটে আনলাম।

টিকিটের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়েই দিদি বলে, ছ'টায়! সর্বনাশ! আমি তো পাঁচটা-সওয়া পাঁচটার আগে বাড়িই ফিরতে পারি না।

—কাল একটু কষ্ট করে সাড়ে চারটের মধ্যে ফিরে এসো। এখান থেকে আমরা বেরুব ঠিক সওয়া পাঁচটায়।

দিদি হাসতে হাসতে বলে, তুমি তোমার গাড়ি নিয়ে চারটের সময় স্কুলের সামনে ওয়েট করো ; তাহলে...

—সরি! আমার গাড়ি নেই।

—গাড়ি কিনছ না কেন? থলি ভর্তি টাকা মাইনে পাচ্ছো ; অফিস থেকে কার লোনও পাবে। গাড়ি কিনতে অসুবিধে কোথায়?

বুবুনদা উঠে দাঁড়িয়েই একটু হেসে বলে, কথা দিচ্ছি, বিয়ের সাতদিনের মধ্যে গাড়ি কিনব।

ওর কথা শুনে সবার মুখেই হাসি ফুটে ওঠে। বুবুনদা বেরিয়ে যেতেই ছোট পিসী দিদিকে বলে, কাল অর্পণ বাবা ঠিক ট্যাক্সি নিয়ে তোর স্কুলের সামনে অপেক্ষা করবে।

দিদি রান্নাঘর থেকে বেরুবার জন্য পা বাড়িয়েই বলে, টিকিট যখন কেটেছে তখন একটু খরচা তো করতেই হবে।

পরের দিন দিদি আর বুবুনদাকে একসঙ্গে বেরুতে দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে যাই। বুবুনদা ধুতি আর আর্দির পাঞ্জাবি পরেছে, পায়ে কোলাপুরী চটি ; দিদি যথারীতি পরেছে তাঁতের শাড়ি। ভিতরটা গঙ্গাজলের মত রং, সুন্দর মেরুণ পাড়। আলতো করে মাথায় খোপা বাঁধা, কপালে বিরাট মেরুণ টিপ।

ওদের ট্যাক্সি স্টার্ট দিতেই ছোট পিসী যেন আপনমনেই বলেন, কবে যে এদের চারটে হাত এক হবে!

আমি মুখে কিছু বলি না। মনে মনে বলি, ছোট পিসী, ছোড়দির বিয়ে আর আমার চাকরি না হওয়া পর্যন্ত এদের চারটে হাত এক হবে না।

## দুই

এ সংসারে কিছু কিছু মানুষ আছেন, যারা কখনই কোন কারণেই কারুর উপরই খুশি না। এইসব মানুষের মনে সীমাহীন দ্বন্দ্ব, সংশয় ও সর্বোপরি সন্দেহ। আমার বাবা ঠিক এই ধরনের মানুষ। অথচ তার কোন কারণ নেই।

ঠাকুর্দা দমদমে ভাড়াটে বাড়িতে থাকলেও তাঁর দোকান খুবই ভাল চলতো। দোকানটা নিশ্চয়ই বেশ বড় ছিল ; তা না হলে কী তাঁর শাড়ির দোকানে সাতজন কর্মচারী থাকে? যাইহোক দেশ দু'টুকরো হবার পর যে উদ্বাস্তুর ঢল নামল পশ্চিমবঙ্গে, তারা সরকারী-বেসরকারী খালি জমি দখল করে বসে পড়ল। সেই নৈরাজ্যের সময় ঠাকুর্দা সাতজন কর্মচারীর সেনাবাহিনী নিয়ে এই কলোনীতে বারো-তেরো কাঠা জমি দখল করেন। দু'দিনের মধ্যেই চাটাই আর ত্রিপল দিয়ে চারদিকে চারখানা ঘরও তৈরি করে কর্মচারীদের থাকতে বললেন। পরবর্তীকালে এখানে তিনখানা ঘরের দালান বাড়ি তৈরি করেই দমদমের দোকান বিক্রি করে ওখানকার পাট চুকিয়ে এখানে চলে আসেন। প্রথম দিকে না হলেও পরে এই কলোনীর বাজারের দোকানও বেশ জমে ওঠে। ঠাকুর্দা ব্যাঙ্কে টাকা জমানোয় বিশ্বাসী না থাকলেও দোকানে লাখ লাখ টাকার শাড়ি আর ছেলেমেয়েদের সবরকম জামাকাপড় মজুত রাখতেন। উনি অত্যন্ত পরিশ্রমীও ছিলেন। নিজে প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন মেটিয়াবুরুজ আর হাওড়ার বাঁকড়ায় গিয়ে ছেলেদের জামা-প্যান্ট ও মেয়েদের ফ্রক আর ইজের কিনে আনতেন। খদ্দেরদের তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন বলে বাজারের মধ্যে ওঁর দোকানেই বেশি খদ্দের হতো। ভাবী-পুত্রবধূর জন্য তিনি প্রায় পঞ্চাশ ভরির সোনার গয়নাও কেনেন।

এক কথায় আমার ঠাকুর্দা ছিলেন কেনারাম আর আমার বাবা হচ্ছেন বেচারাম। তাছাড়া যেমন খিটখিটে তেমনি কুঁড়ে। তাইতো ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর থেকেই শুধু বহুদিনের কর্মচারীদের সঙ্গেই না, খদ্দেরদের সঙ্গেও ঝগড়া বিবাদ শুরু হলো।

পরিণাম?

দিন দিন দোকানের খদ্দের কমতে লাগলো। প্রথমে দোকানের অর্ধেক বিক্রি করলেন ঠাকুর্দার আমলের দুই কর্মচারীকে আর আমাদের বাড়ির জমির এক অংশ। মা বলেন, ঐসব টাকা দিয়েই উনি আমাদের বিয়ের খরচ সামলান।

বর্তমানে?

দোকান, বাড়ির সাত কাঠা জমি আর সব সোনাদানা বিক্রি করে অর্ধেক টাকাও ব্যাঙ্কে রাখতে পারেন নি। দিদি যখন মাত্র ছ' সাত বছরের আর ছোড়দি তিন বছরের তখন থেকেই বাবা বাড়িতে বসে আছেন। তাঁর না আছে কোন শখ-আনন্দ, না আছে কোন বন্ধু।

মা, ছোট পিসী আর আমরা তিন ভাই বোনই ঠিক বিপরীত চরিত্রের।

মা বাথরুম থেকে বেরুতেই ছোট পিসী এক গাল হেসে বলেন, ও বৌদি, মালার ছেলে হয়েছে।

মা-ও এক গাল হেসে বলেন, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ওর মা এখুনি এসে খবর দিয়ে এক প্লেট মিষ্টি দিয়ে গেল।

—খুব আনন্দের খবর।

মা প্রায় না থেমেই বলেন, খুকী কাল স্কুল থেকে ফেরার পথে যখন হাসপাতালে মালাকে দেখতে যায়, তখনও তো মেয়েটার বিশেষ ব্যথাই ওঠেনি।

—ব্যথা উঠেছে ন'টার পর আর সাড়ে ন'টাতেই প্রসব করেছে।

—তার মানে মালাকে খুব বেশি ব্যথা সহ্য করতে হয়নি।

এবার ছোট পিসী বলেন, মালা ছেলেকে নিয়ে বাড়ি এলেই তুমি আর আমি দেখতে যাব।

—তা তো যাবই।

সেই দিন থেকেই ছোট পিসী বেশ কয়েকটা ছেঁড়া শাড়ি-লুঙি নিয়ে বসল হাত সেলাইয়ের মেসিনের সামনে কাঁথা তৈরির জন্য। কাঁথা সেলাই করতে করতেই উনি মাকে বলেন, খুকীকে বলব কালই যেন দু' এক গজ ছিট কিনে আনে। ছেলেটার জন্য চটপট কয়েকটা জামা তৈরি করে ফেলব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বোলো।

সন্ধে ঘুরে যাবার বেশ খানিকটা পরে দিদি বাড়ি ফিরেই প্রায় লাফাতে লাফাতে রান্নাঘরে ঢুকেই ছোট পিসী আর মাকে হাসতে হাসতে বলে, তোমরা ভাবতে পারবে না মালার ছেলেটা কি সুন্দর হয়েছে।

ওরা দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে বলেন, তাই নাকি?

দিদি যেন ওদের কথা শুনতেই পায় না। আনন্দে উত্তেজনায় বলে যায়, ছেলেটা ড্যাব ড্যাব করে আমার দিকে চেয়েছিল।

ও একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, ছেলেটা মালাকে মোটেও কষ্ট দেয়নি।

মা একটু হেসে বলেন, কষ্ট না পেলে কি মা হওয়া যায়? এখন ছেলে হবার

আনন্দে মালা কষ্টের কথা ভুলে গেছে।

ক'দিন পর মা আর ছোট পিসী পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরে হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে মালাদি আর তার ছেলেকে দেখতে যাবার জন্য ঘর থেকে বেরুতেই বাবা মা'র দিকে তাকিয়ে বলেন, এত সেজেগুজে চললে কোথায়?

—মালা আর মালার ছেলেকে দেখতে।

—হাতে করে কি নিয়ে যাচ্ছো?

মা জবাব দেবার আগেই ছোট পিসী বলেন, বাচ্চাটার জন্য আমি কাঁথা সেলাই করে নিয়ে যাচ্ছি।

—ও!

বাবা সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, তা সংসার ফেলে দু'জনকেই এখন মালার ছেলেকে দেখতে যেতে হবে?

ছোট পিসী স্পষ্ট জবাব দেন, সমাজ-সংসারে বাস করতে হলে এরকম যেতেই হয়। আমরা তো তোমার মত অসামাজিক হয়ে যাইনি।

বাবা চুপ করেন ঠিকই কিন্তু মনে মনে বেশ বিরক্তিবোধ করেন।

বাবা শুধু অসামাজিক না, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। দিদি আর মালাদি একই সঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়েছে। কোনকালেই বাবা আমাদের সব বইপত্তর কিনে দেন না। আমাদের তিনজনকেই কলোনীর অন্য ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বই নিয়ে পড়তে হয়েছে, বিশেষ করে দিদিকে। হায়ার সেকেন্ডারী আর বি. এ. পড়ার সময় বাবা তো দিদিকে দু'চারখানার বেশি বই কিনে দেননি। দিদি মালাদির সহযোগিতা না পেলে কোনকালেই হায়ার সেকেন্ডাবী বা বি. এ. পাশ করতে পারতো না। পরীক্ষার মাস তিনেক আগেই মালাদি সব বইখাতা এনে রাখতো দিদির কাছে একসঙ্গে পড়াশুনা করবে বলে। বুবুনদা ছাড়া যে দিদিকে সত্যজিৎ-তপন সিন্‌হার ছবি দেখিয়েছে বা ভাল ভাল গানের অনুষ্ঠানে নিয়ে গেছে, সে তো মালাদি। দিদি গান শুনতে ভালবাসে বলে দিদির জন্মদিনে একটা ছোট টেপ রেকর্ডার আর ছ'টা ক্যাসেট উপহার দেয়। মালাদি মাঝে মাঝেই আরো কত কি দেয়। বাবার কাছে এই বন্ধুত্ব হৃদ্যতা সহযোগিতার কোন মূল্য নেই।

ইদানীং আমাকে মাঝে মাঝেই চন্দনার সঙ্গে সল্ট লেকের বিকাশ ভবনে যেতে হয় ওর বাবা, আমাদের সবার মেজ কাকার পেনসানের ব্যাপারে। প্রায় চার বছর হলো মেজ কাকা স্কুল থেকে রিটায়ার করেছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত পেনসান পাচ্ছেন না। চন্দনার দাদা বিয়ের পর থেকেই মেজ কাকাকে মাসে মাসে মাত্র একশ' টাকা

পাঠায়। এর বেশি বুঝি তার পাঠাবার ক্ষমতা নেই। যে ছেলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হবার পর থেকেই জামসেদপুরে টাটার কারখানায় চাকরি করছে, সে এর বেশি পাঠাতে পারে না ভাবলেও অবাক হতে হয়। অথচ চন্দনার দাদা-বৌদির কোন বছর কাশ্মীর, কোন বছর বোম্বে-গোয়া বা দক্ষিণ ভারত বেড়াতে যেতে অর্থাভাব হয় না। গত বছর শিলং বেড়িয়ে জামসেদপুর ফেরার পথে চন্দনার বৌদি শ্বশুরকে একটা শাল দিয়ে ধন্য করেছেন। নেহাত চন্দনা দু'বেলা টিউশানী করে আর মেজ কাকা শ'পাঁচেক টাকা ভাড়া পান বলে ওরা দু'জনে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে না।

আমি ক্লাশ ইলেভেন-এ পড়াশুনা শুরু করতে না করতেই একদিন মেজ কাকা আমাকে বললেন, আমি তো সন্ধেবেলায় কোথাও বেরোই না ; চন্দনাকে পড়াই। ইচ্ছে করলে তুইও রোজ সন্ধের সময় চলে আসিস। তোকেও পড়াব।

এই মেজ কাকার কাছে না পড়লে আমি কখনই সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করতাম না। অথচ চন্দনাকে আমার কাছে আসতে দেখলেই বাবার মেজাজ বিগড়ে যায়।

বাবা আমাদের পরিবারের ইয়া ইয়া খান। তাঁর ফতোয়া একেবারে সুপ্রীম কোর্টের হুকুম। অন্যদের শত অনুরোধ-উপরোধ অনুনয়-বিনয়েও বাবার হুকুম নড়বে না। দিদি ও মেজকাকার সঙ্গে পরামর্শ করেই আমি ঠিক করি বি. এ. পড়ব। সেকথা শুনেই বাবা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন—বি. এ. পাশ করে কী ঘোড়ার ঘাস কাটবি? আজকাল বি. এ. পাশ করে কর্পোরেশনের মেথরের চাকরিও জুটবে না। তুই বি. কম. পড়বি।

প্রায় না থেমেই উনি বললেন, বি. কম. পাশ করতে পারলে কোন না কোন চাকরি ঠিকই জুটবে। তোর কপাল ভাল হলে হয়তো কোন না কোন ব্যাঙ্কেই চাকরি পেয়ে যাবি।

কাকে বোঝাব অ্যাকাউনটেন্সী আমার মাথায় ঢোকে না।

বাবার হুকুম তামিল করতে গিয়ে আমি পার্ট-ওয়ান পরীক্ষাতেই ধরাশায়ী হলাম। তারপর? পড়া বন্ধ।

এখন বাবা আমাকে যখন-তখন বলেন, তোর দাদা-দিদি-বন্ধুর তো সীমা নেই। ওদের হাতে-পায় ধরে অন্তত একটা বেয়ারা-চাপরাশীর চাকরি জোগাড় কর। আর কত কাল আমার ঘাড়ে চেপে থাকবি?

ছোড়দি দুম করে একটা সাউথ কোরীয়ান ইলেকট্রনিক্স কোম্পানীতে রিসেপসনিস্টের চাকরি পাওয়ায় আমার অবস্থা আরো কাহিল। বাবা আমাকে বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ, মিতু কেমন নিজের চেষ্টায় একটা বিদেশী কোম্পানীতে বারো শ' আর ফ্রী খাওয়া-দাওয়ার চাকরি জোগাড় করল ; আর তুই?

আমি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকি।

—তুই হচ্ছিস ধম্মের ষাঁড়। খাচ্ছিস-দাচ্ছিস আর ঘুরে বেড়াচ্ছিস।

সত্যি ছোড়দির চাকরিটা বেশ ভাল। বাবাকে বারো শ' টাকা মাইনের কথা বললেও আসলে ও পাবে প্রায় তেইশ' টাকা। এছাড়া চা আর লাঞ্চ ফ্রী। ডিউটি হচ্ছে আটটা থেকে চারটে। তবে হ্যাঁ, বাড়ি থেকে বেরুতে হয় সাড়ে ছ'টার মধ্যে। সাড়ে সাতটা-আটটার আগে কোনদিনই বাড়ি ফিরতে পারে না ; তবু মুখে হাসি। রান্নাঘরে বসে হাসতে হাসতে আমাদের বলে, সারাদিন এয়ারকন্ডিসনড্ ঘরে থাকি বলে একটুকুও ক্লান্তিবোধ করতে হয় না।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে বাবাকে সাড়ে সাত শ' টাকা দিয়ে ছোড়দি বলল, বাবা, বাকি টাকা রেখে দিচ্ছি আমার যাতায়াতের খরচের জন্য।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেখে দে।

বাবা এক গাল হেসে বলেন।

আগে? ছোড়দির পোষাক-পরিচ্ছদ আব ঠোঁটে লিপস্টিক দেখলেই বাবা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চিৎকার শুরু করতেন। আর এখন? ছোড়দি জীনস্-এর উপর পাতলা পাঞ্জাবি পরে বেরুলেও বাবা এক গাল হেসে বলেন, সাবধানে যাবি।

ছোড়দি চাকরি পাওয়ায় আমাদের সবারই কপাল খুলে গেল। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই ও মা, ছোট পিসী আর আমাকে একশ' করে টাকা দিয়ে বলল, এটা তোমাদের হাত খরচের জন্য। দিদিকে দিল একটা খুব সুন্দর তাঁতের শাড়ি। শাড়ি দেখেই দিদি বলল, কী করেছিস মিতু? এত দামী শাড়ি আমি পরি?

ছোড়দি দু'হাত দিয়ে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলল, এত কাল তুইই তো আমাদের সব প্রয়োজন শখ-আনন্দ মিটিয়েছিস। আমি তোকে যা দেব, তোকে মুখ বুজে নিতে হবে। কোনদিন আমাকে কিচ্ছু বলবি না।

দিদি কী বলবে? চুপ করে থাকে।

এর পর ছোড়দি আমাদের সামনেই দিদিকে বলল, ছ'টা পর্যন্ত ডিউটি করলে রোজ পঞ্চান্ন টাকা পাব। তাছাড়া বিকেলে কফি-স্নাকস্ ছাড়া গড়িয়াহাট পর্যন্ত অফিসের গাড়িতে আসতে পারব বলে আমি রাজী হয়ে গেছি।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই আমি বলি, ভালই করেছিস। তুই চারটের ডিউটি শেষ করে বাসে এলে তো সাতটার আগে গড়িয়াহাট পৌঁছতে পারছিস না।

—একে আমাদের ফ্যাক্টরী থেকে বাস টার্মিনাস বেশ দূর ; তার উপর বাস বদল করতে হয়। সাতটার আগে একদিনও গড়িয়াহাট পৌঁছতে পারছি না।

দিদিও বলল, এত রাস্তা বাসে আসার ধকলও কী কম? তুই ঠিকই করেছিস

মিতু।

মাত্র এক সপ্তাহ ওভার টাইম করেই ছোড়দি একটা দারুণ চমক দিল। অফিসের গাড়িতে একটা কালার টি. ভি. নিয়ে হাজির।

কী ব্যাপার?

ছোড়দি হাসতে হাসতে বলল, প্রত্যেক মাসে এক সপ্তাহের ওভার টাইমের পেমেন্ট কাটতে দিলে কোম্পানী টি. ভি. দেবে জানাতেই আমরা সবাই রাজি।

ছোড়দি চাকরি পাওয়ায় বুবুনদাও খুব খুশি।

গত রবিবার সকালে উনি আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতেই বললেন, মিতু চাকরি পাওয়ায় আমার দুটো লাভ হয়েছে।

দিদি জিজ্ঞেস করে, তোমার আবার দুটো লাভ হলো মানে?

—প্রথম কথা সাউথ কোরিয়ায় তৈরি একটা চমৎকার কলম পেয়েছি।...

—তা তো আমরা জানি?

বুবুনদা একটু হেসে বলে, ও রোজ আমাকে দু'বার ফোন করে বলে একঘেয়েমী থেকে মুক্তি পাই। ওর সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভাল লাগে।

ছোড়দি সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে ভাল লাগে বলবেন না। ভাল লাগে যখন দিদি আবেগ দিয়ে টেলিফোনে আপনাকে বলে, রাজা, প্লীজ সওয়া পাঁচটায় গড়িয়াহাটের যশোদা ভবনের সামনে...

ওর কথা শেষ হবার আগেই মা আর ছোট পিসী আঁচল দিয়ে মুখের হাসি লুকিয়ে প্রায় লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আমিও হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসি কিন্তু কানে আসে দিদির কথা।

—আঃ! মিতু, কী হচ্ছে?

ছোড়দি বলে, কী এমন বলেছি যে বকুনি দিচ্ছিস? তুই যে বুবুনদাকে রাজা বলিস আর বুবুনদা যে তোকে...

ছোড়দি চাকরি পাবার পর আমাদের সংসারের ছবিটা বেশ বদলে গেল। দিদি আর ছোড়দির টাকা পাবার পর বাবা অন্তত নিত্য অভাব-অনটনের কথা বলেন না। রোজই বাজার থেকে ভাল মাছ আনেন। দিদি এখন বেশ ভাল ভাল শাড়ি পরে বেরোয়। মা বা ছোট পিসী আর সেলাই করা শাড়ি পরেন না। তাছাড়া ছোড়দি অফিস থেকে ফেরার পথে গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে প্রায়ই কিছু না কিছু কিনে আনে।

প্রতি রবিবারের মত গত রবিবারও সকালে আমাদের রান্নাঘরের মজলিশে এসে

হাজির হয়েই বুবুনদা ব্যাঙ্কের পাশ বই দিদির সামনে ধরে বলে, লোপা, এই যে তোমার পাশ বই। আপ-টু-ডেট করে দিয়েছি।

দিদি পাশ বই দেখেই অবাক হয়ে বলে, একি! এত টাকা আমার অ্যাকাউন্টস-এ তো থাকার কথা নয়।

বুবুনদা একটু হেসে বলে, অন্যের টাকা তো তোমার নামে জমা হতে পারে না।

—আমার তো এত টাকা থাকতে পারে না। অসম্ভব ব্যাপার!

ওদের কথা শুনে আমরাও অবাক। ছোড়দি যথারীতি লুচি-আলুর দম খেতে খেতেই দিদির দিকে তাকিয়ে বলে, তোর নামে যদি বেশি টাকা থাকেও, তাতে দুঃশ্চিন্তার কী আছে?

দিদি বেশ চিন্তিত হয়েই বুবুনদাকে বলে, তোমাদের কোন না কোন স্টাফ নিশ্চয়ই গণ্ডগোল করেছে। আমার কখনই এত টাকা থাকতে পারে না।

বুবুনদা বেশ জোরের সঙ্গেই বলে, না, না, তা অসম্ভব। প্রতিদিনের সব জমা আর উইথড্রয়াল তিন-তিনজন অফিসার আলাদাভাবে চেক করেন।

পরের দিন স্কুলে যাবার সময়ই দিদি বলল, ফিরতে দেরি হবে। কয়েকটা কাজ সেরে বাড়ি ফিরব। ছোড়দি ফিরে আসার প্রায় ঘণ্টা খানেক পর দিদি ফিরল ; দিদির পিছন পিছন এলো বুবুনদা।

আমাকে সামনে দেখেই দিদি জিজ্ঞেস করল, মিতু কোথায় রে?

—রান্নাঘরে মা-ছোট পিসীর সঙ্গে বক বক করছে।

দিদি আর বুবুনদা জুতা খুলেই রান্নাঘরে হাজির। দিদি রান্নাঘরে পা দিয়েই বলল, মিতু কান ধর।

ছোড়দি ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক হয়ে বলে, আমি কী অন্যায় করেছি যে কান ধরব?

—তুই আর তোর বুবুনদা কী করেছিস?

বুবুনদা চাপা হাসি হেসে বলে, মিতু, লোপার জেরার ঠেলায় আমি সত্যি কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি।

আমি, মা আর ছোট পিসী হা করে ওদের দিকে চেয়ে থাকি।

এবার ছোড়দি বুবুনদার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, দিদির কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকলে কি করে পেটে কথা থাকবে?

দিদি মা-ছোট পিসীর দিকে তাকিয়ে বলে, মিতু প্রত্যেক মাসে ওভার টাইমের টাকা আমার নামে জমা করছে।

ছোড়দি বলে, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হলো?

—তোর টাকা তোর নামে জমা করবি ; আমার নামে করবি কেন?

ছোড়দি হাসতে হাসতে বলে, তুই কি টাকা মেরে দিবি যে তোর নামে টাকা জমা দেওয়া যাবে না?

ও না থেমেই বলে, তুই তো পালিয়ে যাচ্ছিস না! এ বাড়ি ছেড়ে সারাজীবন তো থাকবি তোর রাজার প্রাসাদে!

ওর কথায় সবাই হেসে উঠি।

আগে মনে করতাম, ছোড়দি খুব স্বার্থপর ; শুধু নিজেকে নিয়েই মত্ত থাকতে চায়। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি, ও চাকরি-বাকরি করে টাকা পাবার পর আমাদের সবার জন্য এত কিছু করবে, নিজের নামে টাকা না জমিয়ে দিদির নামে টাকা জমা করবে। দিদিকে আমরা দু' ভাইবোন অসম্ভব শ্রদ্ধা করি; ওর কাছে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করি। আমার আর ছোড়দির মধ্যে নিত্য খিটিমিটি হলেও বরাবরই আমরা দু'জনে খুবই ঘনিষ্ঠ। দিদির কাছে আমি হচ্ছি ওর এক টুকরো স্বপ্ন ; আমি আর ছোড়দি হচ্ছি বন্ধু। তবুও আমি ওকে চিনতে পারি নি।

মানুষ সম্পর্কে বিচার করতে, সিদ্ধান্ত নিতে আমরা কত ভুল করি। ঘন কালো শ্রাবণের মেঘের আড়ালেও যে সূর্য থাকে, তা আমরা কেন সব সময় মেনে নিতে পারি না? কেন বিশ্বাস করি না, মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ হবারও বিশেষ সময় আছে? মেঘ না হলে কি ময়ূর পাখনা মেলে? শীত না পড়লে কি গোলাপ তার রূপ-লাবণ্য-মাধুর্য প্রকাশ করে?

# তিন

সেদিন শনিবার।

তখন ক'টা বাজে? বোধহয় সাড়ে আটটা-পৌনে ন'টা বাজে। বাবা তখনও বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। আমরা সবাই টি. ভি. দেখছি।

হঠাৎ কানে এলো বাবার চিৎকার। আমরা সবাই প্রায় ছিটকে বেরিয়ে আসি। দেখি বাবা রাঙাদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, কত দিন পর এলি বলতো রাঙা।

রাঙাদাকে দেখে আমাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

রাঙাদা এগিয়ে এসে মা আর ছোট পিসীকে প্রণাম করে ; আমরা তিনজনে প্রণাম করি রাঙাদাকে।

মা রাঙাদার হাত ধরে বলে, আয়, আয়, ভিতরে আয়।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে আমি একটু কথা বলি ; তারপর তোমরা বোলো।

রাঙাদা মাকে বলে, মামী, আগে চা দাও। চা খেতে খেতে মামার সঙ্গে কথা বলে আমি আসছি।

একটু পরেই মা চা আর এক টুকরো কেক এনে রাঙাদার সামনে রেখে বলেন, আগে কেক খেয়ে চা খাবি।

রাঙাদা কেক তুলতে হাত বাড়াতেই দিদি ওর হাত চেপে ধরে বলে, আমি খাইয়ে দিচ্ছি। তুমি ময়লা হাতে কেক ধরবে না।

রাঙাদা মুহূর্তের জন্য দিদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেই হাঁ করে, দিদি কেক খাইয়ে দেয়।

দিদি ওকে কেক খাইয়ে ঘরে যায় কিন্তু বাবার কি ওর সঙ্গে কথা বলা শেষ হয়? মা ধৈর্য ধরতে না পেরে শেষ পর্যন্ত রাঙাদার হাত ধরে বলেন, আয় তো ভিতরে। কাল আবার তোরা কথা বলিস।

রাঙাদা মার সঙ্গে ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বাবা বলেন, হ্যাঁরে, রাঙা, ক'দিন থাকবি?

—কাল তো কোন কাজ হবে না। ইচ্ছে আছে বুধবার ফিরব।

মা এগুতে এগুতেই গজগজ করেন, ছেলেটা আসতে না আসতেই যাবার কথা!

রাঙাদা হচ্ছে আমাদের বাড়ির ভি-ভি-আই-পি। মা-বাবা-ছোট পিসীর পরম

আদরের স্নেহের রাঙা ; আমাদের তিন ভাইবোনের পরম গর্বের দাদা। মা-বাবারা মনে করেন রাঙার মত ছেলে হয় না, আমরা মনে করি অমন স্নেহপরায়ণ দাদা দুর্লভ।

রাঙাদা হচ্ছে আমার বড় পিসীর ছেলে। পাঁচ মেয়ের পর বড় পিসীর এই ছেলে হবার বছর পাঁচেক পরই বড় পিসেমশাই মারা যান। ছোটবেলায় রাঙাদার হরদম সর্দি-কাশি জ্বর হতো বলে বড় পিসীর ভয় হয়। মনে করেন, ছেলেরও রাজ রোগ হলো নাকি? তাইতো মা-বাবার বিয়ে হবার পর পরই বড় পিসী চিকিৎসার জন্য ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন মামা বাড়ি। রাঙাদা বড় পিসীর কাছে ফিরে গেলেন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার পর। না, রাঙাদা আর পড়াশুনা করেনি। ফরিদপুর ফিরে গিয়ে পারিবারিক ব্যবসায় লেগে গেল কিন্তু বড় পিসী মারা যাবার বছর খানেক পরই কলকাতায় ফিরে আসে বেশ কিছু টাকাকড়ি নিয়ে। তারপর তো রাঙাদা চলে যায় রাণাঘাটে। এখনও রাঙাদা ওখানেই ব্যবসা করে, ওখানেই বাড়ি করেছে। বছর আষ্টেক হলো রাঙাদার বিয়ে হয়েছে। ঐ বিয়ে উপলক্ষেই আমরা সবাই জীবনে প্রথম ও বোধহয় শেষ বারের মত বাইরে যাই। আমি তখন নেহাতই কিশোর কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে খুব আনন্দে কেটেছিল ক'টা দিন।

রাঙাদা এলে আমাদের বাড়ির সবকিছু উল্টে-পাল্টে যায়। বাবা না, রাঙাদা বাজার যাবে। বাজার থেকে ফিরেই রাঙাদা ছোট পিসীকে বলবে, ও মাসী! চার-চারটে বেল এনেছি। বিকেলে বেলের সরবত করবে; আমরা সবাই খাবো।

এবার মা'র দিকে তাকিয়ে রাঙাদা বলে, মামী, তোমার জন্য চিতলের পেটি এনেছি। আমাদেরও একটু প্রসাদ দিও।

মা হাসেন।

—এই মিতু, এই নে তোর আমসত্ত্ব।... খুকী, এই যে তোর মিষ্টি আমের আচার।. .পাপাই, এই আপেলগুলো তুই খাবি।

কিছু কিছু ব্যাপার দেখে আমরা ভাইবোনেরা হাসাহাসি করি। ঠিক আগের মতই রাঙাদা বাবার বিছানা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে টেবিলের উপর দু' গেলাস জল ঢেকে রাখল, আগের মতই মা রাঙাদাকে ভাত মেখে দিলেন।

রাঙাদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে, তোরা হাসছিস কেন? মামীর মাখা ভাত খেয়েই তো বড় হলাম।

দিদি মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলে, তাই বলে এই বুড়ো বয়সেও?

—আমি কোনদিনই মামা-মামী আর মাসীর কাছে বুড়ো হবো না। তুই জন্মাবার

আগেই তো ওরা আমাকে সন্তান জ্ঞানে মানুষ করেছেন ; আমি তোদের বড় পিসীর পেটে হলেও সব দিক দিয়ে আমি মামা-মামীর প্রথম সন্তান।

মা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমরা দু'জনে যে কথা আর কাউকে বলতে পারি না, সেসব কথা শুধু রাঙাকেই বলতে পারি।

ছোড়দি খেতে খেতে বলে, তা আমরা খুব ভাল করেই জানি।

সতি রাঙাদা এলে মা আর বাবার যেন প্রাইভেট কথা শেষই হয় না।

রাঙাদার নাম হচ্ছে জগদীশ। ওদের বাড়ির সবাই ওকে জগা বলে ডাকে। ওকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর বলে মা-বাবা আদর করে ওর নাম রেখেছেন রাঙা। আগে রাঙাদা প্রত্যেক মাসে কলকাতা আসত ; এখন বছরে বার দুয়েক আসে দোকানের মালপত্র কিনতে। তার কারণ রাঙাদা এখন বিয়ে করেছেন ; বৌদিকে একা রেখে আসতে পারেন না। তবে প্রধান কারণ দোকান ফেলে আসা মুস্কিল।

রাঙাদা বরাবরই ভাবভোলা ধরনের মানুষ। বিয়ে করতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিলেন না। ওর এক কাকিমা একবার মা-বাবাকে বললেন, খুব সুন্দরী একটা মেয়ে আছে। স্কুলের উঁচু ক্লাশে পড়া ছাড়াও খুব ভাল নাচ-গান জানে। মেয়েটির মা নেই; বাবা আবার বিয়ে করায় মেয়েটি ছ'বছর বয়স থেকেই এক মাসীর কাছে আছে। মাসী-মেসোর অর্থ বল নেই বলে ওর বিয়ের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। আমার খুব ইচ্ছে জগার সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার কিন্তু জগা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত মা-বাবার অনুরোধেই রাঙাদা বিয়ে করতে রাজি হয় কিন্তু শর্ত ছিল একটি। রাঙাদা মাকে বলে, মামী, আমি তোমাকে সোজা কথা বলছি, মেজ কাকিমা চাইছেন বলেই আমি মেয়েটিকে বিয়ে করব না। মেয়েটিকে যদি তোমার, মাসীর আর খুকীর পছন্দ হয়, তবেই আমি বিয়ে করব।

রাঙাবৌদিকে দেখে ওদের তিনজনেরই পছন্দ হয়। তিনজনেই একবাক্যে স্বীকার করল, হ্যাঁ, মেয়েটি সত্যি সুন্দরী। সব সময়ই মুখে হাসি লেগে আছে।

দিদি বলল, মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। কোন জড়তা নেই আলাপ ব্যবহারে।

রাঙাদার বিয়ে হয়েছে ঠিক আট বছর আগে। তখন আমার বয়স ছিল তের আর এখন আমি একুশ বছরের যুবক। তের বছর বয়সের কোন কিশোরের পক্ষেই মেয়েদের রূপ-যৌবনের বিচার করা সম্ভব না। আমিও তখন রাঙা বৌদির রূপ-যৌবনের বিচার করি নি। শুধু এইটুকু মনে আছে, তাকে দেখে সুন্দরীই মনে হয়েছিল। বিবাহিত জীবন আট বছরের হলেও রাঙাদার কোন সন্তান হয়নি। ঠিক

কি কারণে ওদের সন্তান হয়নি, তা আমি জানি না। তবে বাড়িতে কানাঘুষায় যা শুনি, তাতে মনে হয়, রাঙা বৌদির পক্ষে মা হওয়া সম্ভব নয়। বোধহয় নিজের এই ত্রুটির জন্যই রাঙা বৌদি কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যান না। তবে উনি না এলেও কখনও মা আর বাবা, আবার কখনও ছোট পিসী আর দিদি বছরে একবার অন্তত কয়েক দিনের জন্য ওদের ওখানে যান। ওখান থেকে ফিরে ওরা সবাই রাঙা বৌদির সেবা-যত্ন ও আন্তরিকতার প্রশংসা করেন।

সে যাইহোক রাঙাদা আসায় যথারীতি আনন্দের জোয়ার আসে। রবিবার ভোরবেলায় রাঙাদা ট্যাক্সি করে মা আর ছোট পিসীকে নিয়ে গেল কালীঘাট। রাত্রে আমাদের তিন ভাইবোনকে নিয়ে গেল ট্যাংরায় চাইনীজ খাওয়াতে। সোমবার থেকে রাঙাদা ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গিয়ে ফিরে আসে রাত সাড়ে আটটা-ন'টায়। সোমবার রাত্রে বাড়িতে পা দিয়েই রাঙাদা বাবার কাছে গিয়ে বলল, মামা, আপনার চশমার ফ্রেম বদলে এনেছি।

চশমা হাতে নিয়েই বাবা বলেন, বাঁচিয়েছিস! তুই ছাড়া আর কাউকে দিয়ে এই কাজ হতো না।

—আপনি পাপাইকে বললেও সে ফ্রেম বদলে আনতো।

—ও অপদার্থের দ্বারা কোন কাজ হবে না। মেয়েদের সময় থাকলে ওদের একজন ঠিকই ফ্রেম বদলে আনতো।

পরের দিন রাঙাদা বাড়ি ফিরেই আমার হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট দিয়ে বলে, পাপাই, তোর হাতে ঘড়ি নেই বলে এই ঘড়িটা তোর জন্য এনেছি।

কথাটা শুনেই বাবা বললেন, বাঁদরটা কি চাকরি-বাকরি করে যে ওর ঘড়ি লাগবে?

রাঙাদা বলে, মামা, আজকাল দশ-বারো বয়সের ছেলেমেয়েরাও ঘড়ি পরে।

বাবা তবু বলেন, যাদের অঢেল টাকা আছে, তারা যা ইচ্ছে করতে পারে কিন্তু আমাদের মত সংসারের বেকার ছেলেদের এসব বিলাসিতা সাজে না।

না, রাঙাদা আর কিছু বলে না।

আগে ছোড়দি সম্পর্কেও বাবা হরদম টিকা-টিপ্পনী করতেন কিন্তু ও রোজগার করতে শুরু করতেই বাবা এখন ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সেদিন রাত্রে রাঙাদা আমাদের সঙ্গে খেতে বসেই বলে, দেখছি মামা পাপাই-এর উপর খুবই খাপ্পা। পাপাই যে ইচ্ছে করে চাকরি করছে না, তা তো নয়। মামা কিছুতেই স্বীকার করতে চান না যে আজকাল ইচ্ছে করলেই চাকরি পাওয়া যায় না।

ছোট পিসী বলেন, পাপাই এখন দাদার দু'চোখের বিষ। দাদার ধারণা ওর মত

অকর্ম্মণ্য ছেলে আর দুনিয়ায় নেই।

মা বলেন, জানিস রাঙা, তোর মামা পাপাইকে নিয়ে নিত্য অশান্তি করেন। ছেলেটাকে কি আমরা তাড়িয়ে দেব? ছেলেটাকে বি. এ. পড়তে না দিয়ে উনিই ওকে বাধ্য করলেন বি. কম. পড়তে কিন্তু যেই ও পার্ট-ওয়ানে ফেল করল, উনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

ছোড়দি রাঙাদার দিকে তাকিয়ে বলে, পাপাই-এর উপর বাবার এত রাগের কোন কারণ দেখতে পাই না। দিদি রোজগার করতে শুরু করার পর থেকেই ও আমাদের দু'ভাইবোনের জামা-কাপড় শখ-আনন্দের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। বাবার হাতে পুরো মাইর্নের টাকাটাও তুলে দেয়।

ও এক নিঃশ্বাসে বলে, সত্যি কথা বলতে কি দিদির টাকাতেই তো সংসারের বারো আনা খরচ চলতো।

ছোট পিসী বলেন, সত্যিই তাই।

রাঙাদা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, পাপাই, মামার কথায় ঘাবড়ে যাস না। দেখছিস তো আমরা সবাই তোর দলে!

আমি শুধু একটু হাসি।

রাণাঘাট ফিরে যাবার আগের দিন সন্ধের পর রাঙাদার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাদা আলাদাভাবে গোপন বৈঠক হলো বাবা আর মা-ছোট পিসী-দিদির। কিছুক্ষণের জন্য ছোড়দিও সে বৈঠকে যোগদান করলো। ভেবে পাই না হঠাৎ এদের এত আলাপ-আলোচনার কারণ কী?

খেতে বসতে না বসতেই রাঙাদা আমাকে বলল, পাপাই, খাওয়া-দাওয়ার পর তোর সঙ্গে কথা আছে।

সবার খাওয়া-দাওয়া মেটার পর আমার আর দিদির ঘরেই বসল বৈঠক। বাবা ছাড়া সবাই উপস্থিত। সবার সামনেই রাঙাদা আমাকে জিজ্ঞেস করল, পাপাই, তুই কী আবার পড়তে চাস? নাকি চাকরি করার কথা ভাবছিস?

—আমি পড়তে চাই।

আমি না থেমেই বলি, গ্রাজুয়েট না হয়ে আমি চাকরি করব না।

রাঙাদা বলল, খুব ভাল কথা। আমরা সবাইও তাই চাই। এবার বল আমার ওখানে থেকে পড়াশুনা করতে তোর কোন আপত্তি আছে?

—এখানে থেকে তো বাবা আমাকে বি. এ. পড়তে দেবেন না। তোমার ওখানে থেকে যদি পড়তে পারি, তাহলে আপত্তি করব কেন?

—খুব ভাল কথা।

রাঙাদা একটু হেসে বলে, আমাদের সবারই ভয় ছিল হয়তো তুই কলকাতা ছেড়ে যেতে রাজি হবি না। অনেক ছেলেই তো বন্ধুবান্ধব ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না, তাই...

ওকে আর বলতে না দিয়েই আমি বলি, দেখো রাঙাদা, লেখাপড়া করতে পারছি না বলেই বন্ধুবান্ধব নিয়ে মেতে থাকি। চব্বিশ ঘণ্টা তো বাড়িতে বসে থাকা যায় না।

—ঠিক বলেছিস।

দিদি আমাকে বলে, পাপাই, ওখানে তুই সত্যি ভাল থাকবি। সব চাইতে বড় কথা, এখানে যেমন দিনরাত্তির তোকে বাবার কথা শুনতে হয়, ওখানে তোকে এই অশান্তি ভোগ করতে হবে না।

ও না থেমেই বলে যায়, রাঙাবৌদিকে দিনের মধ্যে কুড়ি ঘণ্টাই একলা একলা থাকতে হয়। তুই ওখানে থাকলে রাঙাবৌদিও হাতে স্বর্গ পাবে। তাছাড়া ওখানে তো দুটো ঘর ফাঁকাই পড়ে থাকে।

মা বললেন, রাঙা বৌমা মানুষকে এমন আপন করে নিতে পারে, যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পাপাই ওখানে থাকলে আমরাও সবদিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকব।

ছোট পিসীও মা আর দিদির কথা পুনরুক্তি করলেন।

ছোড়দি বলল, রাণাঘাট তো বেশি দূরে না। পাপাই দু'এক মাস অন্তরই দু'চারদিনের জন্য এখানেও আসতে পারবে।

এবার রাঙাদা আমাকে বলেন, তুই বোধহয় কালই আমার সঙ্গে যেতে পারবি না!

আমি একটু হেসে বলি, না রাঙাদা, আমি কাল যেতে পারব না কিন্তু দিন দশেকের মধ্যেই আসছি।

আমি না থেমেই বলি, তবে তুমি ওখানকার কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ করো যাতে আমি ভর্তি হতে পারি।

—সে তো করবই।

পরের দিনই রাঙাদা রাণাঘাট চলে গেল।

দিন পাঁচেক পরই মা'র কাছে রাঙাবৌদির চিঠি এলো।...

পরম পূজনীয়া মামী,

তোমাদের ছেলে কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর থেকে শুধু তোমাদের গল্পই করছেন। এই মানুষটি তোমাদের কাছে পেলে যে কি আনন্দ পায় তা আমি খুব ভাল করেই জানি। ওকে কাছে পেয়ে তোমরা সবাইই যে হাতে চাঁদ পাও, তা আমি জানি।

তোমরা আমাকেও এমন কাছে টেনে নিয়েছ যে কখনই নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবতে পারি না। তোমরা যেমন আমাদের কাছে যা খুশি দাবি করতে পারো, আমরাও তেমনি তোমাদের কাছে ইচ্ছা মত আবদার করতে পারি। জটিল-কুটিল এই সমাজ-সংসারে এই ধরনের শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসার সম্পর্ক সত্যি দুর্লভ। এজন্য আমি মনে মনে যেমন শান্তি পাই, তেমনি গর্ববোধ করি।

তবে এই চিঠি লিখছি পাপাই আমাদের কাছে থাকবে, এই খবর শোনার আনন্দে। সত্যি কথা বলতে কি আনন্দে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। ওকে কাছে পেলে আমি প্রাণভরে কথা বলতে পারব। গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টা তর্ক-বিতর্ক করতে পারব। দিনের বারো আনা সময় বোবা হয়ে থাকতে থাকতে ঠিক যখন আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে চলেছিল, তখনই পাপাই-এর আসার খবর পেয়ে আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি নতুন করে বেঁচে থাকার।

অনেক দিন পাপাইকে দেখি না। তবে এবার তোমাদের ছেলের কাছে শুনলাম, ও এখন দেখতে দারুণ হয়েছে ও স্বাস্থ্যও ভাল হয়েছে। যে কোন ছেলেমেয়েকে অনেক পরে দেখতে খুব মজা লাগে, তাই না?...

চিঠিটা পড়ে শুধু অন্যরা না, আমিও খুশি হলাম। মনে হলো, রাঙাদা ও রাঙাবৌদির কাছে আমি ভালই থাকব। দু'তিন দিনের মধ্যে আমি বন্ধুবান্ধব আর দিদি-ছোড়দির সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করলাম, সামনের রবিবারই আমি রওনা হবো।

## চার

বার তিনেক কলিং বেল ব'জাবার পর রাঙাবৌদি দরজা খুলতেই আমি কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকি। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর রাঙাবৌদি এক গাল হেসে বলে, এসো, পাপাই, এসো।

আমি ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বলি, রাঙাবৌদি, একটু দাঁড়াও।

ও থমকে ঘুরে দাঁড়াতেই আমি হাতের সুটকেশটা নামিয়ে ওকে প্রণাম করি। ও একটু হেসে আমার গাল টিপে আদর করেই বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যায়। আমি ওর পিছন পিছন আসতে আসতেই বলি, রাঙাবৌদি, গাল টিপে আদর করার বয়স আমার আর নেই।

—তুমি বুঝি অনেক বড় হয়েছ?

—নিশ্চয়ই।

—আমিও কী বড় হইনি?

—হয়েছ বৈকি। বিয়ের সময় তুমি তো নেহাতই কিশোরী ছিলে।

ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে একবার দেখেই রাঙাবৌদি বলে, বুঝলে পাপাই, বিয়ের সময় আমি আঠারো বছরের যুবতী ছিলাম।

—হতে পারে।

তিনটে ঘর পাশে রেখে একেবারে কোণার ঘরে পা দিয়েই ও বলে, পাপাই, এইটে তোমার ঘর। বলো, পছন্দ হলো কিনা।

কথাটা বলেই ও পাখার সুইচ অন্ করে।

ঘরখানা মাঝারি সাইজের। ঘরের এক পাশে একটা খাট আর মাঝারি সাইজের স্টিলের আলমারী, অন্য দিকে পড়াশুনা করার চেয়ার-টেবিল, বুক শেল্ফ আর আলনা। খাটে পরিপাটি করে বিছানা পাতা, আলনায় একটা তোয়ালে। এছাড়া দেয়ালে ঝুলছে রাঙাদার দোকানের ক্যালেন্ডার। দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি দুটো জানলা। একটু দূরে একটা বিরাট দিঘি। সব মিলিয়ে ঘরখানি দেখে আমার মন ভরে গেল।

—বুঝলে পাপাই, কাজকর্ম সেরে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ঘরে বসে ঐ দিঘির দিকে চেয়ে থাকি আর কখনো আনন্দে, কখনো দুঃখে হাসি, কাঁদি, গান গাই।

—তোমার এত প্রিয় ঘর আমাকে দিচ্ছো কেন?

আমার চোখের পর চোখ রেখে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লুকিয়ে রাঙাবৌদি

বলে, তোমার ঘরে কি আমি যখন-তখন আসতে পারব না?

একটু হেসে বলি, দিদির মত গান গাইতে পারলে তোমাকে শুনিয়ে দিতাম—আমি অতিথি তোমারই দ্বারে, ওগো বিদেশিনী!

—তুমি অতিথিও না, আমিও বিদেশিনী না।

চঞ্চলা কিশোরীর মত হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ও বলে, দু'কাপ চা করে আনি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রাঙাবৌদি বলে, হাতে সাবান দাও নি বলে দুটো বিস্কুটও আনিনি।

—ভালই করেছ। আমি এখন কিছুই খাবো না।

দু'কাপ চা টেবিলে রেখেই ও বলে, চা খাও।

—আগে জামাটা খুলি ; বড্ড গরম লাগছে।

জামা খুলে চায়ের কাপ হাতে নিই। রাঙাবৌদি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, ব্যায়াম করে বেশ ফার্স্ট ক্লাশ ফিগার হয়েছে। হাড় গিলগিলে ছেলেদের দেখলেই আমার বিরক্ত লাগে।

আমি হাসি।

—সত্যি বলছি, ছেলেরা স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ না হলে মোটেই ভাল লাগে না।

চা খেতে খেতেই বলি, রাঙাদার কাছে শুনলাম, তুমি স্কুলের মেয়েদের নাচ শেখাও।

—না, না, সেরকম কিছু না। খেয়াল করেছ কিনা জানি না, ঠিক মোড়ের মাথাতেই মেয়েদের স্কুল। ঐ স্কুলে আমার চাইতে ঠিক দু'বছরের সিনিয়ার একটি মেয়ে চাকরি করে। স্কুলে পড়ার সময় সে আমার নাচ দেখেছে।

রাঙাবৌদি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে একটু হেসে বলে, ওর পাল্লায় পড়ে স্কুলে ফাংশানের জন্য মাঝে মাঝে একটু-আধটু দেখিয়ে দিই।

আমি একটু হেসে বলি, তার মানে তুমি এখনও বেশ ভালই নাচতে পারো।

আমার কথা শুনে ও আপনমনেই একটু হাসে। দু'এক মিনিট কি যেন ভাবে। তারপর বলে, মুখ বুজে একলা একলা থাকতে হাঁপিয়ে উঠি বলেই মাঝে মাঝেই ঐ একদল মেয়েকে নিয়ে নাচ-গান করতে বেশ ভাল লাগে।

আমি কোন কথা বলি না।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়েই রাঙাবৌদি বলে, এসো পাপাই, আমাদের বাড়িটা ঘুরে দেখবে।

আমার ঠিক পাশের ঘরে ঢুকেই ও বলল, পাপাই, এই ঘরেই আমার রোদনভরা

বসন্তের দিন কাটছে।

রাঙাদা-রাঙাবৌদির দ্বৈতজীবনের খবর আমি জানি না, জানা সম্ভবও না, উচিতও না। শুধু জানি, রাঙাদা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া ওদের কোন সন্তান হয়নি। রাঙাবৌদি যে নিঃসঙ্গতার জ্বালায় ভুগছে, তা এই ক'মিনিটের মধ্যে বুঝতে পারলাম। তবে সে প্রসঙ্গে কোন কথা না বলে একটু হেসে বলি, ঘরখানা দেখেই স্পষ্ট বুঝা যায়, এই ঘরে কোন শিল্পী থাকে।

আমার কথা শুনে রাঙাবৌদি হেসে ওঠে। বলে, এই ঘর হচ্ছে শিল্পীর সমাধি।

ওর পাশের ঘর দেখিয়ে ও বলল, এই ঘর হচ্ছে আমার পতি দেবতার।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে রাঙাবৌদি বলল, তোমার ঘরের ওপাশে আর তোমার রাঙাদার ঘরের পাশে দুটো বাথরুম।

বারান্দার সামনেই উঠান। তার চার কোণায় চারটি মোসাম্ভা গাছ, মাঝখানে একটা শিউলি গাছ।

শোবার ঘরগুলোর ঠিক বিপরীত দিকে উঠানের উত্তর দিকে রান্নাঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর। কোণার দিকে আরো দু'একটা ঘর দেখে জিজ্ঞেস করি, ঐ ঘরে কী হয়?

—ওখানে পিসী থাকে।

—পিসী মানে?

—আসলে উনি হচ্ছেন তোমার দাদার দোকানের এক পুরনো কর্মচারীর মা। উনি খুবই ভাল কর্মচারী ছিলেন কিন্তু অসম্ভব নেশা করতেন। ঐ নেশা করার জন্য লিভারের অসুখে উনি মারা যাবার পর তোমার দাদা ওর মাকে আমাদের এখানে থাকতে দেন।

—ওর আর কোন ছেলেমেয়ে নেই?

—না।

রাঙাবৌদি না থেমেই বলে, পিসী খুবই ভাল মানুষ। নিজের পুজো-আচ্চা আর রান্নাবান্নার সময়টুকু ছাড়া চৌধুরীদের মদনমোহনের মন্দিরে কাটান। উনি আমাদের দু'জনকে খুবই স্নেহ করেন।

—উনি ঘরে আছেন?

—পিসীর এক মাসতুতো বোন থাকে জিয়াগঞ্জে ; উনি সেখানে গিয়েছেন।

হাতের ঘড়ি দেখেই বলি, সওয়া বারোটা বাজে। রাঙাদা কখন আসবে?

—একটা-দেড়টার মধ্যেই এসে যাবে।

উঠান পার হতে হতে আবার জিজ্ঞেস করি, আবার কখন দোকান যাবেন?

—সাড়ে পাঁচটা-ছ'টায়।

—দোকান বন্ধ করে ফেরে কখন?

রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, ফিরবে ভোরবেলায়।

কথাটা শুনেই চমকে উঠি। মুহূর্তের মধ্যে মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জাগে। রাঙাদা কি লুকিয়ে আরো একটা বিয়ে করেছে? নাকি অন্য কোন খারাপ মেয়ের খপ্পরে পড়েছে? এসব বিষয়ে তো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না। তবু প্রশ্ন করি, রাত্রে বাড়ি আসে না কেন? থাকে কোথায়?

ও বোধহয় আমার মনের কথা আঁচ করতে পারে। তাইতো হাসতে হাসতে বলে, ঘরে চলো ; সব বলছি। তবে দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। মদ-মেয়ে তো দূরের কথা, তোমার রাঙাদা বিড়ি-সিগারেটও টান দিতে শিখল না।

ঠিক সেই সময় পর পর দু'বার কলিংবেল বাজল।

রাঙাবৌদি সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, তোমার রাঙাদা এসে গেছে।

হ্যাঁ, সত্যিই রাঙাদা এসেছে। এক হাতে দুটো ফুল কফি, অন্য হাতে একটা থলি। আমাকে দেখেই ওর সারা মুখ হাসিতে ভরে যায়।

রাঙাবৌদি হাসতে হাসতে বলে, ভাইয়ের জন্য এত আগেই দোকান বন্ধ করে বাড়ি এলে?

রাঙাদা সে কথার জবাব না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কখন এলি?

রাঙাদাকে প্রণাম করতে করতে বলি, ঘণ্টা খানেক আগে।

ও আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, চল, ঘরে যাই।

রাঙাবৌদি ফুল কফি আর থলিটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যায়। রাঙাদা ঘরে ঢুকেই পাখা চালিয়ে দিয়েই জামা খুলতে খুলতে বলে, পাপাই, তোর কলেজে ভর্তি হবার কথাবার্তা বলে রেখেছি ; তবে অ্যাডমিশন শুরু হতে আরো সপ্তাহ দুয়েক দেরি আছে।

—হ্যাঁ, তাইতো মনে হয়।

রাঙাবৌদি এক গেলাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে ঘরে ঢুকতেই রাঙাদা একটু হেসে ওকে বলে, দেখেছ, পাপাইকে দেখতে যেমন সুন্দর, সেইরকমই সুন্দর স্বাস্থ্য।

—ওদের তিন ভাইবোনকেই তো দেখতে সুন্দর। রোজ ব্যায়াম করে বলেই ওর স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে।

রাঙাদা আবার বলে, মোট কথা পাপাই দারুণ হ্যান্ডসাম হয়েছে।

রাঙাবৌদি আড়চোখে আমাকে একবার দেখেই চাপা হাসি হেসে বলে, অত প্রশংসা করলে তোমার ভাইয়ের মাথা ঘুরে যাবে।

আমি রাঙাবৌদিকে বলি, এবার আমি তোমার রূপের প্রশংসা করতে শুরু

করলে কিন্তু থামতে পারব না।

—হয়েছে, হয়েছে। এবার দু'ভাই দুই বাথরুমে চান করতে যাও তো। আমার খিদে লেগেছে।

চান-টান করে রাঙাদার সঙ্গে খাবার ঘরে ঢুকেই আমি অবাক।

—কী করেছ রাঙাবৌদি? কাল সারা রাত ধরেই কি রান্না করেছ?

—কাল রাত্তির না, দুপুর থেকেই রান্না করেছি।

—এত কেউ খেতে পারে?

রাঙাদা বলে, আচ্ছা, আচ্ছা বসতো।

আমি খেতে বসেই বলি, রাঙাবৌদি আমি দু'রকম মাছ, মাছ ভাজা আবার মাংস খেতে পারব না।

—তোমার কথা ভেবেই রান্না করলাম আর তুমিই খাবে না?

—মাংস রাত্তিরে খাব ; ওটা সরিয়ে রাখো।

—আমাদের ফ্রীজ নেই। এই গরমে সকালের রান্না কি রাত্তির পর্যন্ত ভাল থাকে?

—তাহলে মাংস রাঙাদাকে দাও।

যাইহোক খেতে শুরু করার পরই বলি, রাঙাবৌদি, তুমি বসলে না কেন? এর পর তোমার একলা একলা খেতে ভাল লাগবে?

—একলা একলা খাব কেন? তুমি তো পাশে বসে থাকবে।

—থাকব বৈকি।

খেতে খেতে নানা কথাবার্তার মাঝখানে রাঙাদা বলে, আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এমন কোন ক্লাব নেই যেখানে তুই ব্যায়াম করতে পারিস। যে ক্লাবে ব্যায়াম করতে পারবি, সেটা অনেক দূর।

—রোজ ভোরবেলায় আমি দিঘির চারপাশে দৌড়ব ; তাহলে আমার ব্যায়াম করার কাজ হবে।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে।

রাঙাবৌদি বলে, পাপাই, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে দিঘির ওখানে হাঁটব।

—খুব ভাল কথা।

খেয়েদেয়ে ঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই রাঙাদা আমাকে বলে, পাপাই, দু'চারদিন পর তোকে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল অনিমেষবাবুর কাছে নিয়ে যাব।

—ঠিক আছে।

—এখন ক'দিন এই শহরটাকে একটু দেখে নে।

—এখানে যখন বছর তিনেক থাকতে হবে, তখন শহরটাকে তো চিনতেই হবে।

আমি হাত-মুখ ধুয়ে নিতে না নিতেই রাঙাবৌদি খেতে বসে। আমি ওর পাশের চেয়ারে বসতেই রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, রোজ দু'বেলাই আমাকে একলা একলা খেতে হয়। আর কিন্তু একলা একলা খেতে বসব না।

—বসবে কেন? আমিও তোমার সঙ্গে খেতে বসব।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি বলি, তবে কলেজে যাবার জন্য দুপুরে তো তোমার সঙ্গে...

আমার কথার মাঝখানেই রাঙাবৌদি বলে, তোমার কলেজ থাকলে রাত্তিরে তো আমরা একসঙ্গে খেতে পারব।

—তা তো খাবই ; আমিও একলা একলা খেতে পারি না।

টুকটাক কথাবার্তা বলতে বলতেই ওর খাওয়া হয়ে গেলে বলে, পাপাই, তুমি ঘরে যাও। আমি একটু কাজ সেরে আসছি।

আমি আমার ঘরে না গিয়ে রাঙাদার ঘরে যাই।

—আয় পাপাই আয়।

আমি চেয়ারে বসেই কোন ভূমিকা না করে বলি, রাঙাদা, তুমি বিকেল সাড়ে পাঁচটা-ছ'টায় বেরিয়ে একেবারে ভোরবেলায় ফিরবে?

—হ্যাঁ ভাই, কোন উপায় নেই।

—কেন?

—এখন চুরি-ডাকাতি খুব বেড়ে গেছে। যখন-তখন দোকানে ডাকাতি হচ্ছে। তাইতো রাত্তিরে দোকানে থাকতেই হয়।

একটু ভেবে বলি, কোন কর্মচারীকে থাকতে বলো না কেন?

রাঙাদা একটু হেসে বলে, আগে প্রায় সব দোকানেই কর্মচারীদের রাখা হতো। তারপর দেখা গেল সেই কর্মচারীদের অনেকেই চুরি করে বলতো, ডাকাতি হয়েছে কিন্তু পরে পুলিশের মার খেয়ে ওরা সব স্বীকার করে।

ও একটু থেমে বলে, তবে ডাকাতি ঠেকাতে গিয়ে দু'জন কর্মচারী মারা যাওয়ায় তারাও এখন দোকানে থাকতে চায় না।

—এ তো আচ্ছা সমস্যা।

—সমস্যা তো বটেই কিন্তু লাখ লাখ টাকার জিনিষ তো দু'চারটে তালার ভরসায় ফেলে আসা যায় না।

—ঠিকই বলেছ কিন্তু রাঙাবৌদির পক্ষে এত বড় বাড়িতে একলা থাকাও তো খুবই কষ্টকর।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাঙাবৌদি ঘরে ঢুকেই আমাকে বলে, এখন থেকে তো তুমিই

থাকবে। আর চিন্তা কি!

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, যাও, পাপাই ঘুমুতে যাও।

—আমি দুপুরে ঘুমোই না।

—তাহলে এসো আমার ঘরে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই বলি, তুমি ঘুমোবে না?

—না, আমিও দুপুরে ঘুমোতে পারি না।

রাঙাবৌদি ওর ঘরে ঢুকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি শোবে নাকি বসবে?

—তুমি শোও; আমি বসে বসেই তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করব। হ্যাঁ, ও শোয় আর আমি চেয়ারে বসি।

—পাপাই, দুপুরে কী করো?

—খবরের কাগজ বইটই পড়ি। তবে টি.ভি'তে খেলা দেখালে খেলা দেখি।

এবার আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, তুমি দুপুরবেলায় কি করো?

—আমিও বইটই আর কাগজ পড়ে সময় কাটাই।

রাঙাবৌদি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বুঝলে পাপাই, দুপুরটা তবু কেটে যায় কিন্তু সন্ধে থেকে সেই ভোর পর্যন্ত একলা থাকতে পাগল হয়ে যাই।

—অত সময় একলা থাকা সত্যি খুব কষ্টকর।

—কষ্টকর না, অসহ্য।

ও ডান হাত দিয়ে আমার একটা হাত ধরে বলে, তুমি আসছ শুনে আমি কি শুধু শুধুই খুশি হয়েছি? ভেবেছি, এবার অন্তত একজনের সঙ্গে কথা বলে বাঁচব।

আমি একটু হেসে বলি, আমিও তোমাদের কাছে এসে বেঁচেছি বাবার টিকা-টিপ্পনীর হাত থেকে।

—হ্যাঁ, তোমার দাদা বলছিল।

—তুমি বিশ্বাস করো, বাবা আমাকে সহ্য করতে পারছিলেন না। ছোট পিসী তো বলতেন, দাদার কথা শুনে যেন মনে হয়, পাপাই ওর ছেলেই না।

—হ্যাঁ, সত্যিই দুঃখের ব্যাপার।

ও এবার একটু হেসে বলে, ওসব দুঃখ-আক্ষেপের কথা ভুলে যাও। এখানে তুমি আমাদের দু'জনের কাছ থেকে কখনই কোন দুঃখ পাবে না।

—তা আমি জানি বলেই তো তোমাদের কাছে এলাম।

একটু থেমে আবার বলি, রাঙাদার কথা বাদ দাও। জন্ম জন্ম তপস্যা না করলে অমন দাদা পাওয়া যায় না। তোমার সঙ্গে খুব মেলামেশা করার সুযোগ না হলেও মা, ছোট পিসী আর দিদির কাছে তোমার প্রশংসা শুনে শুনে আমারও মনে হয়েছে,

তুমিও নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসবে।

রাঙাবৌদি হাসতে হাসতে বলে, ঘোড়ার ডিম ভালবাসব! তোমার সঙ্গে আমি রোজ ঝগড়া করব।

আমিও হাসতে হাসতে বলি, খুব ভাল হবে। আমার ঝগড়া করতে খুব ইচ্ছে করে।

—খুব ভাল কথা।

এইরকম টুকটাক কথাবার্তা বলতে বলতেই রাঙাবৌদি টাইমপিস দেখেই বলে, দেখো তো তোমার দাদা ঘুমুচ্ছেন কিনা।

আমিও ঘরের দরজা থেকেই ফিরে এসেই বলি, রাঙাদা তো ঘরে নেই।

—তাহলে ও চান করতে গেছে। যাই, চা করি।

টাইমপিসের দিকে তাকিয়ে দেখি, পৌনে পাঁচটা বাজে।

রাঙাদা চান করে এসে জামাকাপড় পরতে না পরতেই রাঙাবৌদি ট্রে-তে তিন কাপ চা আর এক প্লেট বিস্কুট নিয়ে বারান্দায় পা দিয়েই একটু গলা চড়িয়ে বলে, পাপাই দাদার ঘরে এসো।

চা খেতে খেতেই রাঙাবৌদি রাঙাদার দিকে তাকিয়ে বলে, কালকের মত হরিপদকে অত তাড়াতাড়ি পাঠিও না। অত আগে খাবার নিয়ে গেলে তোমার খাবার সময় তো ঠাণ্ডা বরফ হয়ে থাকে।

—আজ ন'টা-সাড়ে ন'টার আগে ওকে পাঠাব না।

আমি জিজ্ঞেস করি, রাঙাদা, কখন দোকান বন্ধ করো?

—ন'টায় কিন্তু তখনও দু'চারজন খদ্দের দোকানে থাকেই। তবে ক্যাশ মেলাতে মেলাতে সাড়ে দশটা হয়েই যায়।

—খাও কখন?

—ক্যাশ মেলানো হয়ে গেলেই খেয়ে নিই।

—দোকানে শুতে কষ্ট হয় না?

রাঙাদা একটু হেসে বলে, না, না, কষ্ট হবে কেন?

সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই একটা রিক্সায় বেল শুনেই রাঙাবৌদি একটু হেসে আমাকে বলে, ঐ যে তোমার দাদার প্লেন এসে গেছে।

ওর কথায় আমরা দু'জনেই একটু হাসি।

রাঙাদা বাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতেই রাঙাবৌদির দিকে ফিরে বলে, হরিপদর হাতে বাজারের ফর্দ দিয়ে দিও।...পাপাই, সাবধানে থাকিস।

রাঙাবৌদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, কই, আমাকে তো সাবধানে থাকতে বললে না!

রাঙাদা হাসতে হাসতেই রিক্সায় উঠে যায়।

# পাঁচ

রাঙাদা বেরিয়ে যাবার পর আবার আমরা চা খাই। টুকটাক কথাবার্তা বলি। আস্তে আস্তে গোধূলির শেষ আলো বিদায় নেয়।

রাঙাবৌদি আমার ঘরের জানলা দিয়ে দিঘির দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখার পর বলে, জানো পাপাই, রোজ এই সময়টুকু এই জানলার ধারে বসে গোধূলির আলো মিলিয়ে যেতে দেখি।

আমি একটু হেসে বলি, তুমি বেশ রোমান্টিক আছো।

রাঙাবৌদি সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আমার দিকে চেয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, একশ' বার আমি রোমান্টিক। যে রোমান্টিক না, সে তো এই পৃথিবীর কিছুই ভালবাসতে পারে না।

ও একটু হেসে বলে, শুধু ছেলে-মেয়ের প্রেমেই রোমান্স শেষ হয় না। পাহাড়ের কোলে মেঘের লুকোচুরি, বনে-জঙ্গলে আলোর খেলা, কাঠবিড়ালীদের চাপল্য ও আরো শত সহস্র কতকিছুর মধ্যেই রোমান্স আছে, তাই না?

আমি ওর কথা শুনে অবাক হয়ে যাই। সত্যি কথা বলতে কি আগে কারোর কাছে আমি ঠিক এই ধরনের কথা শুনিনি। আমি বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাই।

হঠাৎ রাঙাবৌদি তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে বলে, যাই, একটু রান্নাবান্না করি।

আমি ওর পিছন পিছন রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলি, একটা ফ্রীজ থাকলে তোমার আর দু'বেলা রান্না করতে হয় না।

—না, পাপাই, আমি ফ্রীজ চাই না। রান্না না করলে সে সময়টুকু কাটাবো কি করে?

এ প্রশ্নের আমি কি জবাব দেব? তাইতো রান্নাঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করি, এখন কি রাঁধবে?

ফুলকফি কাটতে বসেই রাঙাবৌদি বলে, চাউল, চাপাটি, সবজি।

—বাঃ! তুমি তো হিন্দি বলতে পারো।

—জী হা!

আমি হেসে উঠি। বলি, তুমি বেশ রসিক আছো।

ও ফুলকফি কাটতে কাটতেই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, রসিক হওয়াই তো আমার কাল হয়েছে।

—কেন?

—যারা রসিক হয়, রোমান্টিক হয়, তাদের অনুভূতিগুলো খুব সূক্ষ্ম হয় ; সাধারণ মানুষ যা তুচ্ছ মনে করে, যা অগ্রাহ্য করতে পারে, রসিক-রোমান্টিকরা তা পারে না। তাইতো তারা পদে পদে দুঃখ পায়।

আমি ওর কথা শুনে অবাক না হয়ে পারি না।

—আবার রসিক-রোমান্টিকরা অন্যের ছোটখাটো দুঃখ-আক্ষেপ বুঝতে পারে, অন্যেরা তা পারে না।

ও আলু কাটতে কাটতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, যেমন তোমার দিদি। সে যেমন তোমাদের অতি তুচ্ছ দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারে, তোমাদের বাড়ির আর কেউ তা পারে না।

—ঠিক বলেছ।

—খুকী রোমান্টিক বলেই তো এত সেনসেটিভ, এত চার্মিং।

শুনে আমার ভাল লাগে। প্রশ্ন করি, আমাদের বাড়ির অন্যদের চাইতে তুমি বুঝি দিদিকেই সব চাইতে বেশি ভালবাসো, বেশি পছন্দ করো?

—ওকে কে ভালবাসে না?

আমি আবার হেসে বলি, সত্যি আমাদের কলোনীর সবাই দিদিকে ভালবাসে। মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, দিদি তোমাকেও খুব ভালবাসে।

—জানি।

আটা মাখার উদ্যোগ করতে করতে রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, খুকু এলে তো আমরা দু'জনে রাত্তির তিনটে-সাড়ে তিনটে পর্যন্ত গল্প করি।

—অত রাত অবধি কি গল্প করো?

—তুমি বুঝবে না। আমাদের মনের কথা তো তোমরা পুরুষরা বুঝবে না। তাছাড়া সব কথা কি পুরুষ মানুষকে বলা যায়?

—বিয়ের পর স্বামীকে?

—না, তাও যায় না।

রাঙাবৌদি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, কথা বলার অঢেল সময় পড়ে আছে। এখন যাও গা-টা ধুয়ে নাও।

—আমি চান্ করবো।

—তোমার ঘরে আয়না-চিরুনি-পাউডার কিছুই নেই। আমার ঘরে ওসব রাখা আছে।

—আমি পাউডার-টাউডার মাখি না।

—এই গরমে পাউডার মাখলে ভালই লাগবে। তা না হলে ঘামে কষ্ট পাবে।

আমি চান-টান করে এসে রাঙাবৌদির ঘরে চুল আঁচড়াচ্ছি, ঠিক সেই সময় ঘৈর্মাক্ত কলেবর হয়ে ও ঘরে ঢুকেই বসে পড়ে বলে, ইস! রান্নাঘরে কি গরম!

—ঘামে তোমার ব্লাউজ একদম ভিজে গেছে।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতেই ও একটু হেসে বলে, পাপাইবাবু, মেয়েদের কি কম জ্বালা! গরম লাগলে তোমরা দিব্যি খালি গায় থাকতে পারো আর মেয়েরা? এগার-বারো বছর থেকেই তাদের শরীর ঢেকে রাখতেই হবে।

—তোমাদের তো অভ্যাস হয়ে যায়।

—অভ্যাস হলে কি কষ্ট হয় না?

পাখার হাওয়ায় ঘাম শুকিয়ে যেতেই রাঙাবৌদি আলনা থেকে শাড়ি-টাড়ি হাতে তুলে নেয়। বলে, যাই, গায় একটু জল ঢেলে আসি।

—হ্যাঁ, যাও।

রাঙাবৌদি বাথরুমের দিকে পা বাড়াতেই আমি আমার ঘরে যাই। জানলার ধারে বসে আবছা চাঁদের আলোয় দিঘির দিকে তাকিয়ে থাকি।

বেশ কিছুক্ষণ পর রাঙাবৌদির গলা শুনি—জানলার ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ?

ঘুরে দাঁড়িয়েই ওকে দেখে একটু হাসি।

—কী ব্যাপার? হাসছ কেন?

—তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

—যাক! তাও তুমি বললে!

—তার মানে?

ও আপনমনেই একটু হেসে বলে, কে আমাকে সুন্দর বলে?

—কেন রাঙাদা?

—একথার জবাব আজ দেব না।

রাঙাবৌদি প্রায় না থেমেই বলে, এবার বলো কি খাবে? চিড়ে ভাজা খাবে?

—না, না, তোমাকে আবার রান্নাঘরে গিয়ে ভাজাভুজি করতে হবে না।

ও একটু হেসে বলে, চিড়ে ভাজতে আর ক' মিনিট লাগবে।

—না, না, ওসব করতে হবে না।

—কেন? আমার কষ্ট হবে?

—কষ্ট হবে কেন? এসব করা তো তোমার অভ্যাস আছে।

আমার কথা শুনে ও না হেসে পারে না।

—মুড়ি খাবে? মুড়ি মাখব?

—তা খেতে পারি।

রাঙাবৌদি চলে যায়। আমি মনে মনে ভাবি, আমরা পুরুষরা দৈনন্দিন জীবনে কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করি কিন্তু তার পিছনে যে মেয়েদের কী কষ্ট করতে হয়, তা মুহূর্তের জন্যও মনে করি না, মনে করার প্রয়োজনবোধও করি না। আমরা পুরুষরা কি স্বার্থপর!

একটু স্থির হয়ে ভাবলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। পেটের মধ্যে ন'মাস সাড়ে ন'মাস সন্তানধারণ করা কি সহজ কথা। তাছাড়া শুনেছি সন্তান জন্মের সময় সব মায়েদেরই অসম্ভব কষ্ট সহ্য করতে হয়। কখনো কখনো মা আমাকে বলেন, খুকী বা মিতু হবার সময় সত্যি আমার বিশেষ কষ্ট হয়নি কিন্তু তুই হবার আগে পুরো তিন তিন আমাকে অসহ্য ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে। তারপর চৈত্র মাসের গরম।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বলি, মা, আমি সারাজীবনেও তোমাকে কোন কষ্ট দেব না।

মা আমার মুখখানা বুকের উপর চেপে ধরে একটু হেসে বলেন, তা আমি জানি।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর কি মায়েদের কষ্ট শেষ হয়? বিন্দুমাত্র না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাকে কষ্ট করতে হয়। সেই সঙ্গে কত রকমের দুঃশ্চিন্তা।

সন্তান বড় হবার পরও কি কম জ্বালা সহ্য করতে হয় মায়েদের? সন্তান বিপথগামী হলে, নেশাখোর হলে, অকর্মণ্য হলে, দৈতজীবন বিপর্যস্ত হলেও মাকে চোখের জল ফেলতে হয়। হবেই। আমাদের কলোনীতেই তো এই ধরনের কত কি ঘটতে দেখি। সুকুমারের মা তো কাঁদতে কাঁদতে আমার মাকে বলেন, ছেলেটা যদি আতুরেই মারা যেত, তাহলে দু'চারদিন চোখের জল ফেলেই সব ঝামেলা মিটিয়ে দিতে পারতাম। আর এখন? নিজের পেটের ছেলের মৃত্যু কামনা করতে পারি না বলেই প্রতি মুহূর্তে নিজের মৃত্যু কামনা করি।

—এসো, পাপাই এসো।

ঘুরে দেখি, রাঙাবৌদি দুটো বাটিতে মুড়িমাখা আর দু'কাপ চা নিয়ে হাজির।

মুড়ি খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করি, তুমি রোজ এইসময় কিছু খাও?

—খেতে ইচ্ছে করলেও বিশেষ খাই না।

—কেন?

—একলা একলা কি খেতে ইচ্ছে করে? একলা একলা কিছুই করতে ভাল লাগে না।

একটু পরে রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, তোমার দাদা কলকাতা গেলে আমি দু'বেলা রান্নাই করি না। রাত্রে একটু মুড়ি-টুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ি।

আমরা চা খাওয়া শেষ করতে না করতেই আলো চলে গেল। রাঙাবৌদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, এই শুরু হলো!

—শুরু হলো মানে?

—দেখ না রাত্রে ক'বার আলো যায়।

—কলকাতায় তো বিশেষ লোডশেডিং হয় না।

ও বোধহয় একটু হাসে। বলে, গভর্নমেন্ট কলকাতাকে আলো দেবে বলেই তো গ্রাম বাংলাকে অন্ধকারে রাখে।

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, একটা হ্যারিকেন জ্বালাই।

—এই অন্ধকারে যাবে কি করে?

—আমার ঘরে টর্চ লাইট আছে।

রাঙাবৌদি পা বাড়াতেই জিজ্ঞেস করি, আমি আসব?

—না, না, তোমাকে আসতে হবে না।

একটু পরেই রাঙাবৌদি একটা হ্যারিকেন নিয়ে এসে আমার ঘরের দরজার সামনে রেখে আমার খাটে শুয়ে পড়ে। বলে, এসো পাপাই, আমার পাশে বসো।

আমি পাশে বসতেই ও আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, আমার মনে হয় যাদের জীবন শৈশবেই এলোমেলো হয়ে যায়, সারাজীবনই তাদের এলোমেলো হয়ে কাটে।

এসব কথার তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝতে পারি না। শুধু বুঝতে পারি, ওর অনেক দুঃখ। একটু চুপ করে থাকার পর বলি, আমি তো আছি। তোমাকে আর একলাও থাকতে হবে না, দুঃখও থাকবে না।

ও একটু হেসে বলে, তুমি আমার সব দুঃখ দূর করে দেবে?

—দেব না কেন? আমি কি তোমার পর নাকি আমি তোমাকে ভালবাসি না?

রাঙাবৌদি পাশ ফিরে শুয়ে দু'হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে হাসতে হাসতেই বলে, যাক, বাঁচালে। তুমি ছাড়া কেউ বলেনি আমার সব দুঃখ দূর করে দেবে।

—সত্যি বলছি রাঙাবৌদি, যে আমাকে ভালবাসে, তার জন্য আমি সব করতে পারি। তুমি দিদিকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে আমি সত্যি বলছি নাকি মিথ্যে বলছি।

—আমি জানি তুমি মিথ্যে বলবে না। আমি জানি খুকীর সামান্য একটু জ্বর হলেও তুমি তার বিছানা থেকে ওঠো না।

—দিদির শরীর খারাপ হলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

—আমার জ্বর হলে তুমি আমার কাছে বসে থাকবে?

—নিশ্চয়ই থাকব।

সঙ্গে সঙ্গেই একটু হেসে বলি, তাই বলে আমি চাইছি না, তোমার জ্বর-টর হোক।

—তা চাইবে কেন? তবে সব মানুষেরই তো মাঝে-মধ্যে শরীর খারাপ হতে পারে।

—যখন হবে তখন দেখা যাবে।

হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে, মাথার উপর পাখা ঘুরতে শুরু করে। দু'জনেই হেসে উঠি। দু'জনেই প্রায় এক সঙ্গে প্রশ্ন করি, হাসছ কেন?

রাঙাবৌদি বলে, আমি এমনি হাসছি। বলতে পারো, তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে বলেই হাসছি। এবার বলো, তুমি কেন হাসছ।

—আমি তোমাকে দেখে হাসছি। কী ইন্টারেস্টিং মেয়ে তুমি।

—আমি ইন্টারেস্টিং?

—নিশ্চয়ই তুমি ইন্টারেস্টিং। যদি তোমার মনে এত দুঃখই থাকে, তাহলে এত সুন্দর হাসি কোথা থেকে আসে?

—তুমি এসে গেছ ; আমাকে আর একলা একলা থাকতে হচ্ছে না। তাইতো দুঃখ চলে গেছে বলে প্রাণ খুলে হাসতে পারছি।

আমি একটু হাসি। বলি, তাহলে আমি দুঃখহরণ। কি বলো?

একটু পরে আবার আলো চলে যায়।

—দেখছ তো পাপাই, এখানে কেমন যখন-তখন আলো চলে যায়।

—দিনের বেলায় তো লোডশেডিং হলো না।

—দিনের বেলা না যাওয়াতেই বুঝেছি, আজ সন্ধের পর থেকেই জ্বালাবে।

—সারা শহরেই আলো চলে যায়?

—হাসপাতাল আর তার আশেপাশে যায় না।

—বাজারে?

—হ্যাঁ, বাজারেও হয়।

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, সব দোকানেই মালিকরা চাঁদা দিয়ে একটা বিরাট জেনারেটর বসিয়েছে। তাই...

—ভালই করেছে।

—না করে তো উপায় নেই।

একটু পরেই রাঙাবৌদি বলে, লণ্ঠনের আলোয় ঘড়িটা দেখো তো!

ঘড়ি দেখে বলি, ন'টা বাজতে পাঁচ।

—উঠি ; হরিপদ'র আসার সময় হয়ে গেছে।

রাঙাবৌদি লণ্ঠনের আলো বাড়িয়ে বড় দরজার সামনে বারান্দার কোণায় রেখে টর্চলাইট হাতে নিয়ে রান্নাঘর যায়। আমিও ওর পিছন পিছন যাই। লণ্ঠন জ্বালতে জ্বালতেই ও বলে, পাপাই, তুমি ঘরে যাও। আমি তোমার দাদার খাবারটা টিফিন ক্যারিয়ারে ভরেই আসছি।

—কি করব ঘরে গিয়ে? তুমি রাঙাদাব খাবার ঠিক করো।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, রাঙাবৌদি কত পরিপাটি করে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরে। রুটি, আলু-ফুলকফির তরকারী, মাংস, তাছাড়া চার টুকরো করা একটা কাঁচা পেঁয়াজ, একটু লবণ, একটা লঙ্কা। তাছাড়া একটা ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে একটা বড় রসগোল্লা।

আমি বলি, তোমার সব কাজের মধ্যেই বেশ রুচিবোধ আর আন্তরিকতা আছে।

—আন্তরিকতা আছে কিনা বলতে পারব না ; তাবে যা-তা করে কোন কাজ করাই আমি পছন্দ করি না।

—যে এই খাবার খাবে, সে বুঝবে তোমার আন্তরিকতার স্পর্শ।

—জানি না।

লণ্ঠনটা রান্নাঘরে রেখে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে রাঙাবৌদি বারান্দায় উঠতে না উঠতেই কলিং বেল! আলোও জ্বলে ওঠে।

—পাপাই একটু জোরে জিজ্ঞেস করো তো 'কে'।

—কে?

—আমি হরিপদ।

—পাপাই, দরজাটা খোলো।

দরজা খুলতেই হরিপদ এক-গাল হেসে বলে, আপনিই তো দাদাবাবুর ছোট ভাই, তাই না?

আমি জবাব দেবার আগেই রাঙাবৌদি বলে, হ্যাঁ ; ও এখানে কলেজে ভর্তি হবে।

টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে নিয়েই হরিপদ আবার একটু হেসে বলে, খুকীদি আমাকে খুব ভালভাবেই চেনেন।

—হ্যাঁ, দিদি তো মাঝে মাঝে আসে।

—উনি দোকানেও আসেন ; আপনিও আসবেন।

—হ্যাঁ, আসব।

হরিপদ আর দেরি করে না। সাইকেল হাঁকিয়ে চলে যায়।

আবার আলো চলে যায়।

রাঙাবৌদি ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলে, একটু বুদ্ধি কম হলেও হরিপদ যেমন

অনেস্ট, সেইরকমই সিনসিয়ার।

—দেখে সেইরকমই মনে হয়।

ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে ও বলে, পাপাই, তুমি কি এখন খাবে?

—তুমি যদি খাও, তাহলে খাব।

—ক'টা বাজে?

হাতের ঘড়ি দেখে বলি, সওয়া ন'টা।

—তাহলে একটু পরেই খাব, কি বলো?

—হ্যাঁ, ঠিক আছে। এর মধ্যে হয়তো আলো এসে যাবে।

—সেই আশাতেই তো একটু পরে খাব বললাম।

আলো এলো প্রায় পৌনে দশটায়। তারপর আমরা খেতে যাই। খেতে খেতেই রাঙাবৌদি বলে, খেয়ে-দেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে না। গল্প করব।

বলতে পারলাম না, ব্যায়াম করতে যাই বলে পাঁচটার আগেই আমার ঘুম ভেঙে যায় ; তাইতো বেশি রাত পর্যন্ত জাগতে পারি না। বললাম, গল্প করব বৈকি।

খেয়ে-দেয়ে রাঙাবৌদি ভাড়ার ঘর আর খাবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে রান্নাঘরে তালা দেয়। তারপর পিছনের দরজা সদর দরজা আর রাঙাদার ঘরে তালা দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, সাহেব-বিবি-গোলামের ঘড়িবাবুর মত আমি এ বাড়ির তালাবাবু!

—তাইতো দেখছি।

—দু'জনের সংসার হলে কি হবে! কাজের শেষ নেই।

—যাক্ এখন তো তোমার ছুটি!

সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করি, কোন ঘরে বসবে?

—একদিন তোমার ঘরে একদিন আমার ঘরে গল্প হবে। আজ তোমার ঘরেই চলো।

—চলো।

আমার ঘরে ঢুকেই রাঙাবৌদি বলে, তুমি শোও ; আমি তোমার পাশে বসছি।

—তুমি শোও, আমি বসছি।

—ঠিক আছে।

রাঙাবৌদি শোবার পর আমি ওর পাশে বসি।

—আমি একটু সরে শোব? তাহলে তুমিও শুতে পারবে।

—না, না, তোমাকে সরতে হবে না। আমি বসে বসেই...

ও একটু হেসে বলে, কেন? লজ্জা করছে?

আমি জবাব দেবার আগেই বলে, লজ্জার কোন কারণ নেই। তুমি আমার চেয়ে নেক ছোট।

আমি একটু হেসে বলি, তুমি আমার চাইতে মাত্র পাঁচ বছরের বড়। আমার বয়স কুশ আর তোমার ছাব্বিশ।

আমার থুতনি ধরে রাঙাবৌদি বলে, পাপাইবাবু পাঁচ বছর মানে প্রায় দু' হাজার নের বড়। ছেলেখেলার ব্যাপার না!

—তার মানে তুমি বুড়ী হয়েছ।

—শুধু শুধু কষ্ট করে বসে না থেকে বুড়ীর পাশে স্বচ্ছন্দ্যে শুতে পারো। খুকী লে তো আমরা দু'জনে এখানেই শুই।

—বসে বসে গল্প করতে আমার একটুও কষ্ট হবে না।

আবার আলো চলে যায়।

—দেখছ তো পাপাই ; সত্যি বলো, বিরক্ত লাগে কিনা। সারাদিন পর মানুষ একটু শান্তিতে ঘুমুবে তার উপায় নেই।

একটু পরে বলি, এই অন্ধকারে তুমি একলা থাকো কী করে?

—উপায় কী? বুক ফেটে কান্না আসে ; তবু সহ্য করি।

ও একটু থেমে বলে, অন্ধকার তবু সহ্য করা যায় কিন্তু একলা একলা রাত কাটানো সত্যি বড় কষ্টের, বড় দুঃখের।

আলো আসে।

রাঙাবৌদি বলে, দেখছ রসিকতা?

—সত্যি রসিকতা।

আপনমনে একটু ভেবে ও বলে, পাপাই, সত্যি করে বলো তো আজকের দিনটা তামার কেমন কাটলো।

—খুব ভাল।

—কেন বলছো খুব ভাল কাটলো?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলি, তার কারণ তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি।

প্রায় না থেমেই বলি, আসার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি এমন করে কাছে টেনে নিয়েছ য আমি অবাক হয়ে গেছি। এই বারো ঘণ্টার মধ্যেই তুমি এমন আপন করে নিয়েছ য ভাবা যায় না।

—তোমার আসার খবর শোনার পর থেকেই কেবল মনে হয়েছে তুমি এলে

আমার অনেক দুঃখ চলে যাবে। মনে হয়েছে, তোমাকে কাছে পেলে হয়তো আম
অনেক অভাব দূর হবে।

—সারাদিন আমাকে দেখে বুঝতে পেরেছ তো তোমাকে হতাশ হতে হ

খুশির চাপা হাসি হেসে ও মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, তুমি কখনই আমা হতাশ করবে না, করতে পারবে না।

—ঐ আশা নিয়েই বসে থাকো।

—আমার বিছানা থেকে বালিশ এনে অন্তত পিঠে দাও।

—নট এ ব্যাড আইডিয়া।

হ্যাঁ, আমি পাশের ঘর থেকে বালিশ এনে পিঠে দিই।

রাঙাবৌদি জিজ্ঞেস করে, কী, ভাল লাগছে না?

—হ্যাঁ।

আমি হঠাৎ হাই তুলতেই ও উঠে বসে বলে, তুমি শোও। সারাদিন তো আম সঙ্গে বক বক করেই কাটালে। ঘুমের আর দোষ কি!

—না, না, আমার তেমন ঘুম পায়নি।

—শুলেই ঘুমিয়ে পড়বে। আমিও শুতে যাই।

রাঙাবৌদি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে একটা বালিশ নিয়ে ওর ঘরের দি পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়ায়। বলে, দরকার হলেই আমাকে ডাক দিও।

—সে তো ডাকতেই হবে।

ও চলে যায় ওর ঘরে। আমিও আলো অফ্ করে শুয়ে পড়ি কিন্তু কিছুতেই ঘু আসে না। শুধু রাঙাবৌদির কথাই ভাবি। না ভেবে পারি না।

মা, ছোট পিসী আর দিদির কাছে ওর বিষয়ে শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছি ও ঠিক সাধারণ মেয়ে না। ঘরবাড়ি খাওয়া-দাওয়া শাড়ি-গয়নাতেই ওর মন ভেসে যা না। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটলেই ও খুশি। ও চায় মনের আনন্দ।

আজ সারাদিন ওর সঙ্গে কাটিয়ে, ওকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখে, ওর কথাবা শুনে আমি বুঝেছি ওর রুচিবোধ, জীবনযাত্রা, দৃষ্টিভঙ্গী সবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ও অগ্রাহ্যও করা যায় না, দূরে সরিয়ে রাখাও অসম্ভব। মা, ছোট পিসী আর দিদি যেমন মুগ্ধ করেছে, তেমনি মুগ্ধ হয়েছি আমিও!

সত্যি কথা বলতে কি রাঙাবৌদির একটা বিচিত্র মাদকতা আছে। ওর চো মুখে, দেহের প্রতিটি অঙ্গে ছড়িয়ে আছে সেই মাদকতা। এর উপর আছে ওর হা ওর কথা, ওর লাবণ্য। ও অসামান্যা না হলেও অনন্যা নিশ্চয়ই।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবি। একেবারেই ঘুম আসছে না। কখনো কখনো বিছা

ছেড়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ঐ বিরাট বকুলগাছ দেখি ; দেখি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দিঘি, তার চারপাশ। কতক্ষণ যে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তাও বুঝতে পারি না। একবার মনে হয়, আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার বিছানায় শুয়ে পড়ি। অনেক চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারি না। আবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

আমার হলো কি?

হঠাৎ দিদির কথা মনে হলো। অনেক অল্প বয়স থেকেই আমি দিদির ঘরে থাকছি। গত রাত্রিতেও আমি দিদির ঘরে শুয়েছি। দিদি শুধু যুবতী না, পরমা সুন্দরী। লাবণ্য লালিত্যের প্রতিমূর্তি কিন্তু না, দিদি কাউকে মোহগ্রস্থ করে না, মুগ্ধ করে। সব মিলিয়ে দিদি গঙ্গার মত স্নিগ্ধ শান্ত পবিত্র। ওর সান্নিধ্যে মন যেন শুদ্ধ হয়, মনে আগুন জ্বলে ওঠে না।

আর রাঙা বৌদি?

হঠাৎ কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখতেই আমি চমকে উঠি।

—পাপাই, তুমি ঘুমোও নি?

—না, ঘুম আসছে না।

—বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগছে?

—না, না, ওসব কিছু না।

—তবে ঘুমোওনি কেন? জানো ক'টা বাজে?

আমি প্রশ্ন করি না। শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

—সাড়ে তিনটে বাজে।

এবার আমি প্রশ্ন করি, তুমি ঘুমোও নি?

—আমি তো ঘুমুচ্ছিলাম ; বাথরুম যাবার জন্য উঠেছি।

আমি কোন কথা বলি না, বলতে পারি না, তোমার কথা ভাবছি বলে ঘুম আসছে না।

—বলো না পাপাই, ঘুমোওনি কেন? তোমার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে?

আমি শুধু মাথা নেড়ে বলি, না।

—প্লীজ পাপাই, বলো কেন ঘুমোওনি। তুমি না ঘুমুলে কি আমি ঘুমুতে পারি?

দু'এক মিনিট মুখ নীচু করে থাকার পর বলি, কোনদিন তো এভাবে একটা ঘরে একলা থাকিনি, তাই...

রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, এসো, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

আমি আর একটি কথা না বলে বিছানায় শুই। ও আধা শোওয়া অবস্থায় আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দেয়। বোধহয় দু' পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি।

## ছয়

সেদিন দুপুরে রাঙাদা বাড়িতে এসেই আমাকে বলল, পাপাই, পাঁচটার সময় তোকে নিয়ে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল অনিমেষবাবুর বাড়ি যাব।

হ্যাঁ, রাঙাদার সঙ্গে আমি অনিমেষবাবুর বাড়ি যাই। প্রণাম করতেই উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ভাল থাকো।

আমরা বসতেই উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি হায়ার সেকেন্ডারীতে যে নম্বর পেয়েছ, তাতে তোমার ভর্তি হতে কোন সমস্যা হবে না। আমি প্রিন্সিপ্যালকেও তোমার কথা বলেছি। উনিও বলেছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ছেলেকে নিশ্চয়ই ভর্তি করে নেব।

শুনে আমি খুশি হই।

এবার অনিমেষবাবু একটু হেসে বলেন, রাণাঘাটের অনেক ছেলেমেয়েই কলকাতার কলেজে পড়তে যায় আর তুমি কলকাতার ছেলে হয়েও এখানে পড়তে চাও। আমরা তো খুশি হবোই।

উনি একটু থেমে বলেন, তোমার দাদা আমাকে বলেছেন, তোমাকে জোর করে বি.কম. পড়াবার জন্য তোমার দুটো বছর নষ্ট হয়েছে। এবার যখন নিজের ইচ্ছাতেই বি.এ. পড়বে, তখন নিশ্চয়ই তোমার রেজাল্ট ভাল হবে।

রাঙাদা বলল, স্যার, আপনাকে কিন্তু আমার এই ভাইয়ের দিকে একটু নজর রাখতে হবে।

—দেখুন জগদীশবাবু, আপনি দোকানদারী করলেও আপনার মত ভদ্র সভ্য দোকানদার রাণাঘাটে বিশেষ নেই। সেইজন্য আমরা অনেকেই আপনাকে পছন্দ করি। আপনার ভাইকে শুধু আমি কেন, আরো অনেক অধ্যাপকরাই বিশেষ নজর দেবেন। আপনার কিছু ভাবতে হবে না।

বিদায় নেবার আগে অনিমেষবাবু আমাকে বললেন, কাল তিনটের পর কলেজে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি বইপত্তরের কথা বলে দেব। শুধু শুধু সময় নষ্ট না করে এখন থেকেই পড়াশুনা শুরু করে দাও।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই।

প্রণাম করে বিদায় নিই।

দেখতে দেখতে ক'দিনের মধ্যেই আমার জীবনধারা বদলে গেল রাঙাদা-

রাঙাবৌদির জন্য। অনিমেষবাবুর কাছ থেকে বইপত্তরের নাম-টাম জানার তিন-চারদিনের মধ্যেই স্টুডেন্ট লাইব্রেরীকে দিয়ে রাঙাদা সব বই কলকাতা থেকে আনিয়ে দিলেন। হরিপদদার সঙ্গে গিয়ে আমি নিজে খাতা-টাতা কিনলাম।

একদিন দুপুরে খেতে বসে রাঙাদা রাঙাবৌদিকে বলল, তুমি খেয়াল রেখো পাপাইয়ের কখন কি দরকার। যখন যা দরকার, কিনে দিও।

রাঙাদা আমাকে বলে, যখন যা দরকার বৌদিকে বলবি। কোন দ্বিধা করিস না।

আমি একটু হেসে বলি, দ্বিধা করব কেন?

এবার রাঙাবৌদি রাঙাদাকে বলে, তুমি পাপাইকে একটা সাইকেল কিনে দেবে না? সাইকেল না হলে কলেজ যাবে কি করে?

রাঙাদা চাপা হাসি হেসে বলে, আমি সাইকেলের কথা কানাইদাকে বলেছি। উনি বললেন, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই নতুন মডেলের সাইকেলের লট আসবে। তারপর পাপাইকে ওর দোকানে নিয়ে যাব।

হ্যাঁ, আমার নতুন সাইকেলও হয়েছে। রোজই সাইকেলে শহরের এদিক-ওদিক একটু ঘুরে দেখি। হায়ার সেকেন্ডারীর রেজাল্ট বেরুবার পর পরই আমার অ্যাডমিশন হয়ে গেল। বইপত্র আসার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনাও শুরু করেছি। দেখতে দেখতে কলেজে ক্লাশও শুরু হলো।

এখন আমার দিনের শুরু হয় ভোর সাড়ে চারটেয়। বাথরুম পর্ব শেষ করে পাঁচটার আগেই বেরিয়ে পড়ি। দিঘির ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ ফ্রী হ্যান্ড এক্সারসাইজ করার পর দৌড়ই। বাড়ি ফিরি পৌনে ছ'টা-ছ'টায়। ঠিক ঐ সময়ই রাঙাদা আসে। আমরা তিনজনে এক সঙ্গে চা খাই। খবরের কাগজ এলেই রাঙাদা কাগজ পড়তে শুরু করে। আমি আমার ঘরে যাই। রাঙাবৌদি যায় রান্নাঘরে। আমি জামা-প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা-গেঞ্জি পরে পড়তে বসতে না বসতেই রাঙাবৌদি এক গেলাস দুধ নিয়ে হাজির হয়। দুধ খেয়ে ঘণ্টা দুয়েক পড়াশুনা করি। তারপর চান-টান করে কলেজে যাবার প্যান্ট-শার্ট পরতে পরতেই রাঙাদা দরজার সামনে এসে বলে, পাপাই, চল খেয়ে নিই। তরকারী দিয়ে চার-পাঁচটা রুটি খেয়েই কলেজ যাই। অধিকাংশ দিনই একটার মধ্যে ক্লাশ শেষ হলেই ফিরে আসি বাড়ি। আমি আর রাঙাবৌদি একসঙ্গেই খেতে বসি। রাঙাদা আগেই খেয়ে নেয়।

ও মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে, পাপাই সত্যি করে বলো তো ক'জন মেয়ের সঙ্গে ভাব হলো।

আমিও একটু হেসে বলি, তুমি যে অর্থে ভাবের খবর জানতে চাইছ সেরকম ভাব কোন মেয়ের সঙ্গেই হয়নি, হবেও না।

—তোমার মত হ্যান্ডসাম ছেলের প্রেমে পড়বে না কোন মেয়ে, তাই কখনো হয়?

—যদি কোন মেয়ে মনে মনে আমাকে ভালবাসে, তাতে তো আমার কোন ভূমিকা নেই। তবে প্রেম-ট্রেম আমার পোষায় না।

—ইস! কি সাধুপুরুষ!

—তুমি বিশ্বাস করো, আমাদের কলোনীর অনেক মেয়ের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব মেলামেশা আছে কিন্তু কারুর সঙ্গেই প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার নেই।

—নেই বলে যে হবে না, তা তোমাকে কে বলল?

—অন্তত তিন বছর তো তোমার কাছে আছি ; তুমি দেখে নিও।

—দেখব তো বটেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব মিটলে আমরা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলি ; তবে খুব বেশীক্ষণ নয়। আজকাল আমি দুপুরে ঘণ্টা খানেকের জন্য ঘুমোই। রাঙাদা আর আমি একই সঙ্গে ঘুম থেকে উঠি। একটু পরেই রাঙাবৌদি চা আনে ; আমরা সবাই রাঙাদার ঘরে বসেই চা খাই।

চা খেতে খেতেই রাঙাদা আমাকে জিজ্ঞেস করে, তোর কলেজ কেমন লাগছে?

—ভালই।

—অনিমেষবাবু তোদের ক্লাশ নেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনিই তো পলিটিক্যাল সায়েন্সের ফার্স্ট পেপার পড়াচ্ছেন।

—উনি কেমন পড়ান?

—বেশ ভাল।

আমি একটু হেসে বলি, উনি প্রায় রোজই আমাকে একটা না একটা প্রশ্ন করেন। আমি ঠিক মত উত্তর দিতে পারি বলে উনি ক্লাশের সবার সামনেই আমার প্রশংসা করেন।

রাঙাদা একটু হেসে বলে, আসলে উনি দেখছেন, তুই ঠিক মতো পড়াশুনা করছিস কিনা।

—তা আমি বুঝেছি।

ঐসব কথাবার্তা চলতে চলতেই রিক্সা এসে যায়। রাঙাদা দোকানে রওনা হন। আমরা দু'জনে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে বিদায় জানাই। আবার আমরা দু'জনে চা খাই।

—রাঙাবৌদি তুমি কোথাও যাও না কেন?

—কী করে যাবো? একে সংসারের কাজকর্ম, তার উপর এই বাড়ি। কার

ভরসায় আমি বাড়ি থেকে বেরুব?

—হ্যাঁ, সত্যিই সমস্যা।

—ভাল ভাল কত সিনেমা আসে কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারি না। ইদানীং দু'বছরের মধ্যে খুকীর পাল্লায় পড়ে 'উনিশে এপ্রিল' আর 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' দেখতে পেলাম।

একটু থেমে ও বলে, কলকাতায় কত ভাল ভাল নাচের প্রোগ্রাম হয় কিন্তু আমার কপালে ওসব দেখা নেই। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই...

ওর কথার মাঝখানেই আমি জিজ্ঞেস করি, এখানে নাচের অনুষ্ঠান হয় না?

—বছর দুয়েক আগে মমতাশঙ্কর তাঁর দল নিয়ে এসেছিল কিন্তু যথারীতি আমি যেতে পারি নি।

সন্ধে লাগতে না লাগতেই রাঙাবৌদি রাত্রের রান্না করতে যায়। চান করে আমি পড়তে বসি। ঘণ্টা খানেক পর হঠাৎ একটা প্লেট হাতে করে রাঙাবৌদি এসে হাজির হয়।

—পাপাই, টেস্ট করে দেখো তো কেমন হয়েছে।

—একি! তুমি মোগলাই পরটা বানিয়েছ?

মোগলাই পরটার প্লেটটা আমার হাতে দিয়ে ও বলে, সত্যি খেয়ে দেখো তো কেমন হয়েছে।

আমি এক টুকরো মুখে দিয়েই হেসে বলি, এ তো অনাদির মোগলাই পরটা! ফার্স্ট ক্লাশ হয়েছে।

—বাঁচিয়েছ! অনেক দিন পর করলাম বলে মনে মনে ভয় ছিল।

—তা হতে পারে কিন্তু সত্যি ভাল হয়েছে।

—আজকের ডিনারের মেনু কি জানো?

—কি?

—মোগলাই পরটা, মাংস আর পুডিং।

—লাভলি!

—তোমার দাদা আজ রাত্তিরে খাবার দেখে অবাক হয়ে যাবে।

—অবাক হবার মতই ব্যাপার। কোন মধ্যবিত্তের বাড়িতে এসব হয়?

আমার পড়ার টেবিলের পাশেই দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ও বলে, দেখো পাপাই, বৈচিত্র্যই আনন্দ, বৈচিত্র্যই জীবন। নানা ঋতুর পরিবর্তে যদি বারো মাসই শরৎকাল হতো আর প্রত্যেক মাসেই দুর্গাপূজা হতো, তাহলে কি খুব ভাল লাগতো?

—ঠিক বলেছ।

—রবীন্দ্রনাথকে এইজন্য মহাকবি বলি, কারণ তাঁর সৃষ্টিতে আছে অভাবনীয় বৈচিত্র্য।

আমি সম্মতিতে মাথা নাড়ি।

—যার জীবনে বৈচিত্র্য নেই, সে তো মৃত। যেমন আমি।

—তোমার চিন্তায় ভাবনায় মনে যত বৈচিত্র্য আছে, তা ক'জনের মধ্যে দেখা যায়?

—আচ্ছা তুমি পড়ো ; আমি যাই।

আমার হাত থেকে খালি প্লেট নিয়েই রাঙাবৌদি সত্যি সত্যিই লাফাতে লাফাতে উঠোন পার হয়ে রান্নাঘরে ঢোকে।

রাঙাবৌদিকে যত দেখছি, যত ওর কথা শুনছি, আমি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। মধ্যবিত্ত বাড়ির ক'জন মেয়ে-বউ ওর মত কথা বলতে পারে? ও রান্নাঘরে যাবার পরও আমি সঙ্গে সঙ্গে পড়তে শুরু করতে পারি না। ওর কথাই ভাবি। তারপর আবার পড়াশুনায় মন দিই।

হঠাৎ ঘড়িতে দেখি ন'টা বাজে। আমি বইপত্তর গুছিয়ে রেখে উঠতেই দেখি রাঙাবৌদি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। আমি দু'এক মিনিট ওর দিকে চেয়ে থাকার পর বলি, ইউ লুক চার্মিং।

—শুনতে ভালই লাগলো কিন্তু কেউ তো চার্মড হলো না।

—হতেই পারে না।

রাঙাবৌদি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে আমার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, আর পড়বে না?

—না।

—সকাল-সন্ধের নিয়ম করে প্রতিদিন ঘণ্টা চারেক পড়লেই যথেষ্ট।

—আমিও তাই মনে করি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করি, তুমি কী টিফিন ক্যারিয়ারে রাঙাদার খাবার-দাবার ভরে রেখেছ?

—না। আজ হরিপদ দোকান বন্ধ হবার পর আসবে। ও আসার পরই আমি সঙ্গে সঙ্গে পরটা তৈরি করব। এত আগে করলে তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আমি একটু হেসে বলি, রাঙাদাকে সুখে রাখার জন্য তুমি কতভাবে কত কি করো!

ও একটু হেসে বলে, শুধু তোমার দাদার কথা কেন বলছো? আমি কি তোমাকে সুখে রাখার চেষ্টা করছি না?

—একশ' বার করছো।

রাঙাবৌদি আমার বিছানায় বসতেই আমি চেয়ার ঘুরিয়ে ওর মুখোমুখি বসি। ওকে দেখি। জিজ্ঞেস করি, তোমার প্রত্যেকটা শাড়িই ভারী সুন্দর। তুমি কি নিজেই শাড়ি পছন্দ করো? নাকি রাঙাদা...

—আমার অধিকাংশ শাড়িই খুকীর পছন্দ করা। ও এলে আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যায় তোমার দাদার দোকানে আর পছন্দ মত তিন-চারটে শাড়ি নিয়ে আমাকে দেয়।

—হ্যাঁ, দিদির পছন্দ সত্যি ভাল।

—ওর রুচিবোধ আমার খুব ভাল লাগে।

—তবে দিদির মত তোমাকে যে কোন শাড়িতেই দারুণ লাগে। দু'জনেই তো পরমা সুন্দরী।

—আমাকে দেখতে খারাপ না হলেও খুকীর মতো লালিত্য আমার নেই।

বলতে পারি না, শুধু তুমি সুন্দরী না, তোমার চোখে, মুখে, হাসিতে ও সর্বাঙ্গে যে ভরা যৌবনের মাতলামী চলছে, তা যে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরও নেই। শুধু বলি, দিদির বিষয়ে ঠিকই বলেছ কিন্তু তোমার মধ্যে এমন কি আছে, যা দিদির নেই।

আমার মুখের কথা শেষ হতেই ও বলে, আমার মধ্যে যে কালবৈশাখীর ঝড় লুকিয়ে আছে, তা খুকীর মধ্যে নেই।

—ঠিক বলেছ।

ও আপনমনে একটু হেসে বলে, আমি জানি, আমার মধ্যে আমারই দুটো শত্রু লুকিয়ে আছে।

ওর কথার অর্থ বুঝতে পারি না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি।

ও মাথা নেড়ে বলে, এখনই সে দুটো শত্রুর কথা বলব না।

একটু পরেই হরিপদদা আসে। রাঙাবৌদি দুটো মোগলাই পরটা তৈরি করেই মাংস গরম করে দুটো স্টিলের পাত্রে রেখে একটা পলিথিন ব্যাগে ভরে হরিপদদার হাতে দিয়ে বলে, দাদা যেন এখনই খেয়ে নেন। যে খাবার দিলাম, তা পরে খেলে ভাল লাগবে না।

হরিপদদা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েই চলে যায়।

—পাপাই, এখন খাবে তো?

—চলো, দু'জনেই খেয়ে নিই।

ওর পিছন পিছন রান্নাঘরে ঢুকেই বলি, আমার জন্য একটা করবে।

—একটা খাবে কেন? তুমি দুটো খাবে।

—না, না, রাঙাবৌদি, আমি দুটো পারব না। আমার অত খিদে নেই।

যাইহোক দু'জনে খেতে বসি।

খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করি, হঠাৎ আজ মোগলাই পরটা করলে কেন?

—বুলা আমাদের বাড়িতে ছাড়া আরো একটা বাড়িতে কাজ করে সংসার চালায়।...

—কেন ওর স্বামী?

—সে হতভাগা অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে শ্যামনগরে থাকে। তাইতো বুলাকেই কাজ করে নিজের আর দুটো মেয়ের সব খরচ চালাতে হয়।

—তাই বুঝি ওকে রোজ খাবার-দাবার দাও?

—যা থাকে তাই দিই।

ও একটু থেমে বলে, আজ বুলার বড় মেয়ের জন্মদিন। তোমার দাদা ওর জন্য একটা খুব সুন্দর জামা এনে দিলেন। আর আমি ভাবলাম, আজ অন্তত ওরা সবাই মুখরোচক কিছু...

শুনে আমার ভাল লাগে। বলি, খুব ভাল করেছ।

খেয়েদেয়ে উঠতে উঠতে রাঙাবৌদি বলে, তোমাকে আস্তে আস্তে আমার জীবনের কথা বলব। তাহলে বুঝবে কেন বুলার দুটো মেয়েকে আমি ভালবাসি।

—আজই বলবে।

ও আমার প্লেট বাটি তুলেই বলে, আগে ঘরে যাই তো। তারপর দেখা যাবে।

আমি হাত-মুখ ধোয়ার সময়ই রাঙাবৌদি বলল, পাপাই, তুমি ঘরে যাও। আমি তালা-টালা লাগিয়ে আসছি।

আমি আমার ঘরে আসি। একটু পরে রাঙাবৌদিও ওর বালিশ নিয়ে আমার ঘরে পা দিয়েই বলে, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হয় শুনলে তোমার বন্ধুরা কি বলবে বলো তো!

—আমাকে তো ঘুম পাড়িয়ে দিতে হয় না। শুধু বলি, একটু কাছে থাকো।

—ঐ একই ব্যাপার।

যাইহোক ও বালিশ পিঠে দিয়ে আমার পাশে বসেই বলে, বলো, কি জানতে চাও।

—তোমার ছোটবেলার কথা।

অধীরবাবু সাঁইথিয়ায় একটা অয়েল মিলের ক্যাশিয়ার। অনেক দিনের বিশ্বাসী কর্মচারী বলে মিল মালিক ওকে ভালই মাইনে দেন। সিনেমা রোডের পৈতৃক দোতলা বাড়ির উপরতলায় উনি সস্ত্রীক থাকেন। একতলার সামনের দিকের দুটি ঘর ভাড়া দিয়েছেন দুটি দোকানদারকে ; ভেতর দিকের একটা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম ভাড়া দিয়েছেন বি-ডি-ও অফিসের এক কর্মচারীকে। অন্য দুই ভাইকে রামপুরহাটের বাড়ি আর মুরারই-এর চাষ আবাদের জমি দেবার পর অধীরবাবুর ভাগেও কিছু চায আবাদের জমি জুটেছে পৈতৃক সূত্রে। তবে সেসব জমি মুরারইতে না ; সাঁইথিয়া শহরের দু' আড়াই কিলোমিটার দূরে সিউড়ি যাবার পুরনো রাস্তার ধারে। সব মিলিয়ে অধীরবাবুর আয় বেশ ভালই।

কিন্তু আয় ভাল হলে কি হবে? আয়ের বারো আনা টাকাই উড়িয়ে দেন মদের পিছনে। প্রতিদিন আকণ্ঠ মদ খেয়ে বাড়ি ফেরেন রাত দশটা-এগারটায়। সারা সাঁইথিয়া শহরের লোক ওকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলেই বলে, ঐ যে মাতাল অধীর যাচ্ছে।

ওর আরো একটি গুণ আছে। প্রতি রাত্রে স্ত্রীকে গালাগাল দেওয়া আর নির্যাতন করা এবং এই কাজটি এমন বীরদর্পে করেন যে মাঝে মাঝেই প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ওকে তিরস্কার করতে বাধ্য হন।

মজার কথা অধীরবাবু যত নিন্দিত, ওর স্ত্রী তত বেশি প্রশংসিত। যমুনা দেবী সত্যিই পরমা সুন্দরী। পাড়ার বৃদ্ধারা বলেন, অধীরের বউ সাক্ষাৎ মা দুর্গা। ওর যেমন রূপ, তেমনই গুণ। কচি-কাচা থেকে শুরু করে পাড়ার বুড়ো-বুড়ীরা পর্যন্ত ওকে ভালবাসেন। শ্রদ্ধা করেন আরো একটা বিশেষ কারণে। যমুনা দেবী খুব ভাল গান গাইতেন, বিশেষ করে শ্যামাসঙ্গীত।

বিয়ের ছ'বছর পর যমুনা দেবীর মেয়ে হয় সিউড়ি হাসপাতালে। মেয়ে হয়েছে শুনে অধীরবাবু ব্যস্ততার অছিলায় হাসপাতালেও গেলেন না। শুধু তাই না। মেয়েকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর যমুনা দেবীকে নিত্য গঞ্জনা সহ্য করতে হতো স্বামীর কাছে।

—তুমি তো আচ্ছা অপয়া! প্রথমেই একটা মেয়ে হলো! ছিঃ ছিঃ! লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে?

যমুনা দেবী কিছু বলেন না। যে স্বামী সন্তানের জন্ম দিয়েও এই ধরনের কথা বলে, তাকে বলে লাভ কি?

—তুমি আমার ঘরে শোবে না। তোমার মেয়ের জ্বালাতনে আমার ঘুম হবে না। তাছাড়া পেচ্ছাব-পায়খানা করে বিছানার বারোটা বাজাবে।

যমুনা দেবীর একটা বড় ত্রুটি ছিল। উনি ঝগড়াও করতে পারতেন না, প্রতিবাদও করতেন না। নীরবে সব সহ্য করতেন মেয়ের মুখ চেয়ে। তাছাড়া করবেনই বা কি? যার বাবা নেই, মা নেই, সে যাবে কোথায়?

এইভাবেই দিন কাটে, বছর ঘুরে যায়।

নিরঞ্জনবাবুর মা যমুনা দেবীর মেয়েকে কোলে নিয়ে এক গাল হেসে বলেন, বৌমা, আমি পুরুষ হলে এই এক মাথা পাকা চুল নিয়েও তোমার মেয়েকে বিয়ে করতাম। আহাহা! কি সুন্দর মুখখানা! কি সুন্দর দুটো চোখ! এ মেয়ের মাথায় দারুণ চুলও হবে।

কেষ্টবাবুর স্ত্রী হাসতে হাসতে বলেন, সত্যি যমুনা, তোর মেয়েটা দারুণ দেখতে হবে। এই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য বহু ভাল ভাল ছেলে তোর পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

ওদের কথা শুনে যমুনা দেবী খুশি হন। একটু হাসেন।

রাত্রে স্বামী বাড়ি ফেরার পর যমুনা দেবী কথায় কথায় ওকে জানালেন, মেয়ের সম্পর্কে নিরঞ্জনবাবুর মা আর কেষ্টবাবুর স্ত্রী কি বলেছেন। হাজার হোক মা তো! সন্তানের রূপের প্রশংসার কথা স্বামীকে না বলে থাকতে পারলেন না। ব্যস! মাতাল অধীর স্ত্রীকে এক লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বললেন, তুই কি তোর মেয়েকে বেশ্যা করবি যে তার রূপের প্রশংসা শুনে গলে যাচ্ছিস?

অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেই যমুনা দেবী চিৎকার করে ওঠেন, তুমি একটা পশু! জানোয়ার! মাতাল! বদমাইস!

সঙ্গে সঙ্গে অধীর বিক্রমে মাতাল অধীর শুরু করলেন চোরের মার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাঙাবৌদি বলে, বুঝলে পাপাইবাবু, আমি হচ্ছি ঐ মাতাল অধীরের মেয়ে ; চির দিঃখিনী যমুনা দেবীই এই হতভাগিনীর গর্ভধারিণী।

আমিও পিঠে বালিশ দিয়ে ওর পাশে বসে দু'হাতের মুঠোয় ওর একটা হাত ধরে চুপ করে বসে থাকি।

ও বলে, আমার ধারণা, বাবার কাছে চোরের মার খেয়েই মা'র পেটে এমন আঘাত লাগে যে তিন দিন পরেই রক্তক্ষরণে ওর মৃত্যু হয়।

—তাই নাকি?

—তাইতো মনে হয়।

একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করি, তারপর কি হলো?

—আমার গুণধর পিতৃদেব কালবিলম্ব না করিয়া পুনরায় বিবাহ করিলেন এবং

আমার বিমাতা ঠাকুরানী আমাকে কথায় কথায় প্রহার করিয়া আমাকে ভদ্র করিবার ব্রতে আত্মনিয়োগ করিলেন।

—তখন তোমার বয়স কত?

—সাড়ে চার।

—তারপর?

—মা'র শিক্ষায় আমি অত্যন্ত খারাপ হয়েছি বলে বাবা আমাকে আমার মাসীর কাছে রেখে দিয়ে জন্মের মত দায়িত্ব শেষ করলেন।

—তোমার মাসী কোথায় থাকতেন?

—মালদা।

—ঐ বয়স থেকেই তুমি মাসীর কাছে থেকেছ?

—হ্যাঁ, থাকতে বাধ্য হয়েছি।

—কেন বলছ বাধ্য হয়েছি?

—আর তো কেউ ছিল না যিনি আমাকে দু'বেলা খেতে দেবেন আর থাকতে দেবেন।

—মাসী তোমাকে ভালবাসতেন?

—নেহাত ছোট বোনের মেয়ে ; তাই ফেলে দিতে পারেন নি।

—আর মেসো?

—তিনি আমাকে একটা উৎপাতই মনে করতেন।

—তার মানে ওখানেও খুব সুখে ছিলে, তাই না?

—খুব সুখে ছিলাম।

—কিন্তু ওরা তো তোমাকে স্কুলে পড়িয়েছেন, নাচ-গান শিখিয়েছেন?

রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, একদিনেই সব শুনবে? ঘুম পাচ্ছে না?

—তুমি বলো।

আমার যে ঘুম পাচ্ছে। বেশ মাথাও ধরেছে।

—আচ্ছা তুমি শোও। আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।

—সত্যি আমি শোব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোও। তোমাকে তো সারাদিন কাজ করতে হয়। কতক্ষণ আর বসে থাকবে?

আমি পিঠে বালিশ দিয়ে বসে থাকলেও রাঙাবৌদি শুয়ে পড়ে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাই তুলেই বলে, তুমি অন্তত আধা শোওয়া হয়ে বসো। তা না হলে আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

হ্যাঁ, আমি আধা শোওয়া অবস্থাতেই বসে ওর মাথা টিপে দিই।

—আজ বিকেল থেকেই মাথা ধরেছে কিন্তু এখন কপালের দু'পাশ যেন দপ দপ করছে।

—আর কথা বলো না।

না, রাঙাবৌদি আর কথা বলে না। আমি ওর কপাল টিপে দিই। মাঝে মাঝে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিই। কিন্তু হঠাৎ হাত থেমে যায়। আবছা আলোয় ওকে দেখি আর বড্ড মায়া হয়। ইচ্ছা করে একটু আদর করি। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শাসন করি। মনে মনে বলি, আমার কি অধিকার ওকে আদর করব? আমি আবার ওর মাথা টিপে দিই, মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিই।

একটু পরে আমারও হাই ওঠে। ঘুম পায়। একবার নীচু হয়ে ওর মুখখানা দেখি। মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠিক তখনই ও পাশ ফিরে শুয়ে আমার কোলের উপর একটা হাত রাখে।

আমি আবার হাই তুলি। চোখের পাতা বুজে আসে। তবু আমি আস্তে আস্তে ওর মাথায় মুখে হাত দিই। মাঝে মাঝেই ঘুমের ঘোরে হাত থেমে যায়। বুঝতেই পারিনা কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

বহুদিনের অভ্যাস মতো সাড়ে চারটেয় ঘুম ভাঙ্গে। তখন দেখি, রাঙাবৌদি আমাকে জড়িয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আমার সারা শরীর দিয়ে এক অনাস্বাদিত আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আমি উঠি না, উঠতে পারি না, ইচ্ছাও করে না। আমি বিস্ময়মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে ওকে দেখি। বিভোর হয়ে দেখি।

ঠিক জানি না, কতক্ষণ ঐভাবে ওকে দেখেছি। ও চোখ মেলে তাকাতেই আমার সম্বিত ফিরে আসে। লজ্জায় দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিই।

রাঙাবৌদি আমার মুখের উপর একটা হাত রেখে বলে, আমার কপাল টিপে, মাথায় মুখে হাত দিচ্ছিলে বলে এত ভাল লাগছিল যে ঘুমিয়েই পড়ি।

—আমিও একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ি।

—আমি শুয়েছি বলে কি তোমার অসুবিধে হয়েছে?

—না, না, অসুবিধে কি হবে? কোন অসুবিধে হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করি, তোমার কি অসুবিধে হয়েছে?

—আমি আর খুকী যদি এখানে শুতে পারি, তাহলে তুমি থাকলে অসুবিধে কি হবে?

এবার ও আমার চোখের পর চোখ রেখে বলে, আজ দৌড়তে গেলে না কেন?

আমি একটু চাপা হাসি হেসে বলি, ইচ্ছে হলো না।

## সাত

প্রতি বৃহস্পতিবার রাঙাদাদের দোকান বন্ধ থাকে। তাইতো সেদিন ভোরে ফিরে সারাদিনই বাড়ি থাকে। তবে সন্ধে লাগতে না লাগতেই দোকান যায়। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধেয় বাজার সমিতির মিটিং হয়। যথারীতি হরিপদদা এসে খাবার নিয়ে যায়।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। কলেজ যাবার আগে আমি আর রাঙাদা প্রতিদিনের মত খেতে বসেছি। খেতে খেতেই রাঙাদা রাঙাবৌদির দিকে তাকিয়ে বলল, ভাবছি, রেল লাইনের ওপারের বাজারটা ঘুরে আসি। ওখানে অনেক রকমের মাছ আসে।

রাঙাবৌদি বলল, যাও তো ভালই হয়।

আমি বলি, রোজই তো ভাল ভাল মাছ খাচ্ছি। আবার কেন এই রোদ্দুরে অত দূরের বাজারে যাবে?

রাঙাদা বলল, আমি তো রিক্সায় যাব।

যাইহোক আমি আর দেরি না করে কলেজ রওনা হই। ফিরে আসি দেড়টা নাগাদ।

রাঙাদা দরজা খুলে দেয়। সাইকেল নিয়ে ভিতরে ঢুকেই দেখি বারান্দার কোণায় দাঁড়িয়ে দিদি আর রাঙাবৌদি হাসছে। দিদিকে দেখেই আনন্দে খুশিতে আমি চিৎকার করে উঠি—দিদি!

দিদিও নিজের খুশি চেপে রাখতে পারে না। বাচ্চাদের মত চিৎকার করে ওঠে—পাপাই ভাইয়া!

আমি সাইকেল রেখে লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠতেই দিদি আমাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর আমার মুখখানা নিজের মুখের পর রেখে বলে, মনে হচ্ছে তোকে কত যুগ পরে দেখছি।

রাঙাবৌদি হাসতে হাসতে বলে, খুকী, বুড়ো ধাড়ি ভাইকে আর আদর করতে হবে না।

দিদি আমাকে আদর করতে করতেই বলে, রাঙাবৌদি, রাঙাদা যেমন আমাকে দেখে পাগল হয়ে যায়, আমিও পাপাইকে দেখে সেইরকমই পাগল হই।

যাইহোক কলেজের জামা-প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা পরি। বাথরুমে যাই হাত-মুখ ধুতে। তারপর খাবার ঘরে ঢুকেই দেখি চারজনের একসঙ্গে খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

একটু হেসে বলি, কি ব্যাপার রাঙাবৌদি, আজ যে তুমিও খেতে বসছো?

—ননদিনীর হুকুম তামিল না করলে আমার ঘাড়ে মাথা থাকবে? তাছাড়া তোমার দিদি যা মুখরা!

—দিদি কি তোমার চাইতেও বেশি মুখরা?

যাইহোক খেতে বসেই সব জানতে পারি। শনিবার দিদিদের স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস বলে ছুটি। গতকাল স্কুলে গিয়ে জরুরী কাজ আছে বলে দু'দিনের ছুটি জোগাড় করেই দিদি ছোড়দিকে ফোন করে—মিতু, শনিবার স্কুল বন্ধ। মানসীকে বলে কাল-পরশু ছুটি নিয়েছি পাপাইকে দেখতে যাব বলে।...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ছোড়দি বলে, তুই কী কাল সকালের দিকেই ট্রেন ধরবি।

—হ্যাঁ।

—আমি এখুনি রাঙাদার পাশের দোকানে ফোন করে খবর দিচ্ছি।

—এই কথা বলার জন্যই আমি তোকে ফোন করছি।

—তুই ফোন ছেড়ে দে। আমি এখুনি রাঙাদাকে খবর দিচ্ছি।

এইটুকু শুনেই আমি হেসে বলি, এখন বুঝতে পারছি স্রেফ খুকীর জন্যই রাঙাদা রেল লাইনের ওপারের বাজারে গেল।

—খুকী কি রোজ রোজ আসে? তাই...

—আমাকে খবরটা জানাওনি কেন?

—তোকে সারপ্রাইজ দেবে বলে তোর বৌদি বারণ করলো।

এবার রাঙাবৌদির দিকে তাকিয়ে বলি, দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।

—ঠিক হ্যায়! আমিও জোয়ান অব আর্কের মত লড়ে যাবো।

দিদির কল্যাণে বেশ ভুরিভোজই হলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর দিদি বেশ কিছুক্ষণ রাঙাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। তারপর এলো আমার ঘরে। সেখানে দিদি, রাঙাবৌদি আর আমি কথা বলি।

কথায় কথায় দিদি আমাকে বলে, তুই বলে কাল রাঙাবৌদির খুব সেবা করেছিস?

আমি একটু হেসে বলি, কী করব? হস্টেল সুপারকে তো তেল দিতেই হবে।

রাঙাবৌদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, সে তো দিতেই হবে।

দিদি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, রাঙাদা-রাঙাবৌদি তো তোর প্রশংসায়

পঞ্চমুখ।

—ভাল ছেলের প্রশংসা করতেই হবে।

রাঙাবৌদি আলতো করে আমার গালে একটা চড় মেরে বলে, কি আমার ভাল ছেলে!

—দিদি, দেখছিস আমাকে কি জঘন্য অত্যাচার সহ্য করে এই হস্টেলে থাকতে হচ্ছে?

দিদি শুধু হাসে।

আবার নানা কথা হয়।

দিদিকে জিজ্ঞেস করি, তুই কি রবিবার বিকেলে ফিরবি?

—নারে পাপাই, আমি কালই ফিরে যাব।

—শনিবার পর্যন্ত তো ছুটি ; কাল যাবি কেন?

—শনিবার সকালে ছোট পিসীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাব বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি।

—কেন ছোট পিসীর কি হলো?

—মনে হচ্ছে হঠাৎ প্রেসার বেড়ে গেছে। ইদানীং দু'দিন মাথা ঘুরে পড়ে গেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

দিদি একটু থেমে বলে, শনিবার ছোট পিসীর ই-সি-জি'ও হবে।

আমি একটু ভেবে বলি, তাহলে তো তোকে কালকেই ফিরতে হবে।

ও একটু হেসে বলে, আমি কলকাতায়ও তোকে রোজ কাছে পাই, রোজ তোকে আদর করি।

আমি দিদির কথা শুনে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাই।

ও বলে যায়, আমি স্কুল থেকে ফিরে তোর চিঠি দুটো দু'তিনবার করে পড়ি আর মনে হয়, তুই আমার সামনে বসেই কথা বলছিস।

ওর কথা শুনে আমি না হেসে পারি না।

—তারপর ঐ চিঠি দুটোকে আদর করে বালিশের নীচে রেখে দিই।

আমি গর্বে আনন্দে রাঙাবৌদিকে বলি, দেখছ, দিদি আমাকে কি ভালবাসে।

রাঙাবৌদি কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে, খুকী তোমাকে মাথায় চড়িয়েই তো একটি রাজার বাঁদর তৈরি করেছে। এখানে তো সব সময় দিদিকে কাছে পাবে না; দেখে নিও, আমি তোমাকে কি করি!

আমি হাসতে হাসতে বলি, ও ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়!

দুপুরটা বেশ কাটলো। বিকেলে রাঙাদার ঘরে আমরা সবাই মিলে চা খেতে খেতেও কত কথা হয়। সন্ধে লাগতে না লাগতেই রাঙাদা দোকান যায়।

রাত দশটা বাজলেও হরিপদদা রাঙাদার খাবার নিতে না আসায় শুধু রাঙাবৌদি না, আমি আর দিদিও চিন্তিত না হয়ে পারি না।

সওয়া দশটা বাজল কিন্তু তখনও হরিপদদার দেখা নেই। আর ধৈর্য ধরতে না পেরে আমি রাঙাবৌদিকে বলি, তুমি টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরে দাও। আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

দিদি বলল, কোন কারণে হয়তো হরিপদ আসেনি ; আবার রাঙাদাও দোকান ছেড়ে আসতে পারছে না।

রাঙাবৌদি বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

হঠাৎ কলিং বেল বাজতেই আমরা তিনজনে ছুটে যাই। দরজা খুলতেই যিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন, তিনি হরিপদদা না, স্বয়ং রাঙাদা। তার সারা মুখে হাসি। হাসি আমাদের মুখেও।

রাঙাদা বলে, হরিপদ আর বিশুকে দোকানে রেখে চলে এলাম। ভাবলাম, খুকী যখন কালই চলে যাবে, তখন আজ একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া আর গল্পগুজব করি।

রাঙাবৌদি একটু হেসে দিদিকে বলে, খুকী, আমাকেও এই রকম একটা দাদা জোগাড় করে দাও।

—আমি তো আছি ; আবার দাদা দিয়ে কি করবে?

খেতে বসেই একপ্রস্থ গল্পগুজব হলো। তারপর আসর বসল রাঙাদার ঘরে। একটা বেজে যাবার পর রাঙাবৌদি বলে, খুকী, আর দাদার সঙ্গে কথা বলতে হবে না। এর পর আমরা কখন কথা বলব?

রাঙাদা আমার দিকে তাকিয়ে বলে, পাপাই, তুই ভোরবেলায় উঠেই চায়ের জল বসিয়ে আমাকে ডেকে দিবি। কাল আমিই চা করবো। তোর দিদি আর বৌদি তো সারারাত গল্প করবে।...

দিদির হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই রাঙাবৌদি বলল, খুকীর বদলে কি তোমার সঙ্গে সারারাত গল্প করব?

দিদি রাঙাবৌদির ঘরে যায়, আমি যাই আমার ঘরে।

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই দেখি, বেশ বৃষ্টি হচ্ছে ; আকাশ মেঘে ভর্তি। বৃষ্টির জন্য আমি দিঘির ওদিকে যেতে পারলাম না। ঘরের মধ্যেই ফ্রী-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করি।

চারজনে মিলে যখন চা খাচ্ছি, ঠিক তখনই একবার বেশ জোরে মেঘের গর্জন

হতেই রাঙাবৌদি ভয়ে আতঙ্কে দিদিকে জড়িয়ে ধরে। ওর কাণ্ড দেখে আমি হেসে উঠি। বলি, মেঘ ডাকলে বাচ্চারা ভয় পেতে পারে কিন্তু তুমি...

অসহায়ার দৃষ্টিতে রাঙাবৌদি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, না, না, পাপাই, ঠাট্টা করো না। মেঘের ডাক শুনলে আমার দারুণ ভয় করে।

দিদি বলল, আমাদের এক কলিগ আছে, সেও মেঘের ডাক শুনলে ভীষণ ভয় পায়।

যাইহোক মেঘের গর্জন না হলেও বৃষ্টি একইভাবে চলে। ওরই মধ্যে রাঙাবৌদি রান্নাঘরে যায়। রাঙাদা বাথরুমে যায়, বইপত্র ঠিকঠাক করে আমিও চান করতে যাই। আমি বাথরুম থেকে বেরুতেই দিদি চান করতে যায়।

আমি, রাঙাদা আর দিদি খেতে বসি।

রাঙাবৌদি বলে, খুকী, মাঝে মাঝে এইরকম এসো। তোমার কষ্ট হলেও আমাদের তো আনন্দ হবে।

—কষ্ট আবার কি! সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই আসব।

রাঙাদা বলে, জানিস খুকী, তিন বছর পর আমি কাল রাত্রে বাড়ি ছিলাম শুধু তোর জন্য। সত্যি তুই মাঝে মাঝে আসিস।

আমি বলি, আমি যখন আছি, তখন দিদিকে মাঝে মাঝেই আসতে হবে।

রাঙাবৌদি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, ওহে ছোকরা, তুমি যখন আসোনি, তখনও খুকী সুযোগ পেলেই এখানে এসেছে।

রিক্সা আসে। রাঙাদা দিদিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে দোকানে যাবে ; আমিও কলেজে যাবার জন্য প্রস্তুত। দিদি আমাকে আদর করে বলে, পাপাই ভাইয়া, ভালভাবে পড়াশুনা করিস আর রাঙাদা-রাঙাবৌদিকে দেখিস।

দিদিকে প্রণাম করতে গিয়েই আমার চোখে জল আসে। কোন কথা বলতে পারি না।

দিদি আঁচল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বলে, তুই এভাবে কাঁদলে আমি কি শান্তিতে থাকতে পারব? একটুও মন খারাপ করবি না। আমি মাঝে মাঝেই আসব।

রাঙাদা আর দিদি রিক্সায় উঠতেই রাঙাবৌদি বলে, খুকী, মাসীকে দেখে ডাক্তার কি বলে জানিও।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলি, হ্যাঁ, দিদি, ছোট পিসীর খবর জানাস।

দিদি বলে, আমি মিতুকে দিয়ে রাঙাদাকে খবর দিয়ে দেব।

ঠিক সেই সময় রাঙাদা রাঙাবৌদিকে বলে, একটা কথা বলতে একদম ভুলে

গেছি। আজ মাধবদার ছেলের বৌভাত।...

—মাধবদা মানে তোমাদের বাজার সমিতির সভাপতি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আজ বিকেলবেলায় বাজারের সব কাপড়-চোপড়ের দোকানই বন্ধ থাকবে। আমরা দুপুরেই মাধবদার বাড়ি চলে যাব। সব মিটে গেলেই রাত্রে দোকানে যাব।

—ঠিক আছে।

ওদের রিক্সা ছেড়ে দেয়। আমি ঘরে আসি ব্যাগ নিতে। আমার পিছন পিছন রাঙাবৌদি এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলে, ছাতি নিয়ে সাইকেল চালাবে কি করে?

—ঠিক চালাবো ; তোমার কিচ্ছু চিন্তা নেই।

—তুমি ভিজে যাবে।

—একটু আধটু বৃষ্টিতে ভেজা আমার অভ্যাস আছে।

—একটু-আধটু বৃষ্টি তো হচ্ছে না ; বেশ জোরেই বৃষ্টি হচ্ছে।

—বর্ষাকালে তো বৃষ্টি হবেই।

আমি ব্যাগ আর ছাতি নিয়ে ঘর থেকে বেরুতেই ও জিজ্ঞেস করে, ফিরবে কখন?

—আজ তো মোটে তিনটে পিরিয়ড। সওয়া বারোটায় ক্লাশ শেষ।

কলেজ যাবার পথে খুব বেশি না হলেও প্যান্টের নীচের দিক আর পিঠ ভিজে গেল। বাড়ি ফেরার সময় যেমন বৃষ্টি, তেমনি বাতাস। জবজবে ভিজে জামা-প্যান্ট পরেই বাড়ি ফিরলাম।

আমাকে দেখেই রাঙাবৌদি বলে, ইস! কি ভেজাই ভিজেছ! শিগগির জামা-প্যান্ট ছাড়ো।

—তুমি কফি করো তো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, করছি।

আমি ভেজা জামা-প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা-গেঞ্জি পরার পরপরই রাঙাবৌদি দু'কাপ কফি নিয়ে হাজির।

আমি বলি, ঘণ্টা খানেক আগে যখন বেশ জোরে জোরে মেঘ ডাকছিল, তখন কী করলে?

—আর বলো না! বালিশে মুখ গুঁজে কোনমতে সামলেছি।

কফির কাপে এক চুমুক দিয়ে বলি, মেঘ দেখে মনে হয় না আজ বৃষ্টি থামবে।

এক চুমুক কফি খেয়েই ও বলে, বৃষ্টি হয় হোক কিন্তু এত মেঘের গর্জন হবার কি দরকার?

ওর কথা শুনে আমি হেসে ফেলি।

—হাসছ কেন? ভয় করলে আমি কি করব? সবাই কি সবকিছু সহ্য করতে পারে?

—তা ঠিক।

আমরা খেয়ে দেয়ে উঠতে না উঠতেই বৃষ্টির বেগ আরো বাড়ল ; সমান তালে শুরু হলো মেঘের গর্জন। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে কাছাকাছিই কোথাও বজ্রপাত হলো। ভয়ে-আতঙ্কে রাঙাবৌদি আমাকে জড়িয়ে ধরছে। আমি অস্বস্তিও বোধ করি, ভালও লাগে। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে যায় সারা শরীরের মধ্যে।

বিকেলের দিকে বৃষ্টির বেগ কমে আসে ; শোনা যায় না মেঘের গর্জন।

রাঙাবৌদি বলে, এই ফাঁকে আমি রাত্তিরের রান্না সেরে রাখি।

—আজ আর বিশেষ কিছু রাঁধতে হবে না ; তাছাড়া এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

ও একবার জানলা দিয়ে আকাশের অবস্থা দেখে নিয়েই বলে, পাপাই, শুধু আলুর দম দিয়ে পরটা খেতে পারবে?

—কেন পারব না?

—তাহলে ঠিক খাবার আগেই পরটা করব। আলুর দম তো করাই আছে।

—হ্যাঁ, তাই কোরো।

সন্ধের মুখে বৃষ্টি আরো কমতেই রাঙাবৌদির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলে, তুমি ঘরে থাকো। আমি রান্নাঘরে একটু কাজ সেরে আসি।

—হ্যাঁ, যাও।

আমি ঘরে বসে পলিটিক্যাল সায়েন্সের নোট'এর উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিই। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটা ট্রে হাতে গজেন্দ্র গমনে ঘরে ঢুকে রাঙাবৌদি বলে, এসো, মুড়ি আর বেগুনি খাই।

আমি বাটি থেকে এক মুঠ মুড়ি তুলেই বলি, এমন বর্ষায় এর চাইতে ভাল খাবার হয় না।

—যাই বলো, বৃষ্টি-বাদলের দিনে আর শীতেই গরম গরম তেলেভাজা খেতে বেশি ভাল লাগে।

—হ্যাঁ।

মুড়ি-বেগুনি খাওয়া শেষ হবার একটু আগে রাঙাবৌদি বলে, তুমি কফি খেয়ে পড়াশুনা করবে আর আমি আমার ঘরে বসে আজকের কাগজটা ভাল করে পড়ব।

কফি খেয়ে আমি পড়তে বসি। রাঙাবৌদি চলে যায় ওর ঘরে।

সওয়া ন'টা নাগাদ রাঙাবৌদি আমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, পাপাই, তুমি আর কতক্ষণ পড়বে?

—আর দশ-পনের মিনিট।

—তাহলে আমি পরটা করতে যাই?

—হ্যাঁ, যাও।

আমরা খেতে বসার আগেই আবার বেশ জোরে বৃষ্টি শুরু হলো ; সেইসঙ্গে মেঘের গর্জন। ওরই মধ্যে আমরা খাই। আমি খেয়ে উঠতেই ও বলে, তুমি চলে যেও না। আমি একলা একলা থাকতে পারব না।

—না, না, আমি যাচ্ছি না।

রান্নাঘরের কাজ সেরে, সব দরজায় তালা বন্ধ করে আমরা ঘরের দিকে পা বাড়াতেই ও বলে, দাঁড়াও, তোমার দাদার আর আমার ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করি। কখন যে জলে সব ভিজে যাবে, তার তো ঠিক নেই।

আমার খাটে আমরা দু'জনে পিঠে বালিশ দিয়ে পাশাপাশি বসি আর মেঘ ডাকলেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি মনে মনে হাসি, মুখে কিছু বলি না। রাঙাবৌদির মুখেও কোন কথা নেই।

দশ-পনের মিনিট পরে আমি বলি, চলো, দিঘির ওদিক থেকে ঘুরে আসি।

—আমাকে মেরে কেটে ফেললেও ঘর থেকে বেরুব না।

—তাহলে চলো, উঠোনে গিয়ে একটু ভিজি।

—এসব আজেবাজে কথা আমাকে বলবে না।

—তাহলে কী বলব?

—কিচ্ছু বলতে হবে না। চুপ করে বসে থাকো।

—সারারাত বসে থাকব?

—সারারাত কে বসে থাকতে বলছে? ঘুম এলেই শুয়ে পড়বে।

—আর তুমি?

—যেভাবে মেঘ ডাকছে, তাতে শুয়েও আমার ঘুম আসবে না।

ওর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সত্যি ভীষণ জোরে মেঘের গর্জন হয়; দু'এক মুহূর্তের জন্য ঘরে বাইরে আলোর বন্যা বয়ে যায়। রাঙাবৌদি বিকট চিৎকার করে আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। আমিও দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরি।

দু'এক মিনিট পর রাঙাবৌদি সোজা হয়ে বসেই বলে, নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও বজ্রপাত হয়েছে।

—ঐ বিকট আওয়াজ আর আলো দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে।

—পাপাই, এসো শুয়ে পড়ি।

—তুমি শোও। আমি আরো একুট বসে থাকি।

—না, না, তুমিও শোও।

—সত্যি শোব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোও।

আমি কোন কথা না বলে বসে থাকি। ও কাত হতে শুয়ে আমার একটা হাত দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে।

টুকটাক মেঘের গর্জন চলতে চলতেই আবার বিকট জোরে মেঘের গর্জন হতেই রাঙাবৌদি ভয়ে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, পাপাই!

আমি মুহূর্তের মধ্যে শুয়ে পড়েই দু'হাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিই।

দু'এক মিনিট পরে আবার আমরা বন্ধন মুক্ত হয়ে পাশাপাশি শুয়ে থাকি।

এইভাবেই আরো ঘণ্টা খানেক চলার পর মেঘের গর্জন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি।

আমি মনে মনে কত কি ভাবি। কত প্রশ্ন আসে মনে কিন্তু রাঙাবৌদিকে কিছু বলতে দ্বিধা হয়, লজ্জা করে। মিনিট পনের পর ও বলে, পাপাই, ঘুমিয়েছ?

—না।

—তাহলে যে কথা বলছো না!

—এমনি।

একটু পরই ও জিজ্ঞেস করে, কিছু ভাবছ?

—হ্যাঁ।

—কি ভাবছ?

—তোমার কথা।

—আমার কথা?

—হ্যাঁ, তোমার কথা, আমার কথাও।

—আমার কথা কি ভাবছ?

—অনেক কিছু।

ও বোধহয় আপনমনে একটু হাসে। বলে, অনেক কিছু মানে?

এবার আমি কাত হয়ে শুয়ে বলি, সত্যি বলব কি ভাবছি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো।

—তুমি রাগ করবে না? আমাকে খারাপ ভাববে না?

ও আলতো করে আমার মুখের পর একটা হাতে রেখে বলে, সত্যি বলছি, আমি রাগও করব না, তোমাকে কখনই খারাপ ভাবব না।

কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকার পর বলি, তুমি তো জানো, আমি কচি বাচ্চা না ; একুশ বছরের যুবক।

—তুমি যে যুবক, তা জানি বৈকি।

—তুমিও বুড়ী না।

—কখনই না।

—আমাকে জড়িয়ে শুতে তোমার কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ হয় না? খারাপ লাগে না?

হঠাৎ রাঙাবৌদির কণ্ঠস্বর বদলে যায়। বেশ স্পষ্ট করে বলে, না। তবে তোমার যদি বিন্দুমাত্র কোন আপত্তি থাকে, তাহলে এই মুহূর্তে আমি আমার ঘরে চলে যাচ্ছি।

—আমি কী তাই বলেছি? তবে সত্যি করে বলছি, আমার লজ্জাও করে, দ্বিধাও হয়।

রাঙাবৌদি উঠে বসে। বলে, পাপাই, তুমি এখন বড় হয়েছ। তাই তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি। আশা কবি আমাকে ভুল বুঝবে না। তাছাড়া আজকের রাত্তিরের কথাবার্তা কাউকে কোনদিন বলতে পারবে না।

—না, না, আমি কাউকেই বলব না।

—খুব ছোটবেলা থেকেই আমি খুব দুঃখে কষ্টে অনাদরে অপমানে বড় হয়েছি। আমি লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিলাম। খুব ইচ্ছা ছিল বি. এ-এম. এ. পাশ করবো, কোন বিখ্যাত শিল্পীর কাছে নাচ শিখব। আমি কোনদিন কোন ছেলের সঙ্গে প্রেম করি নি, করবার ইচ্ছাও মনে আসে নি। বিয়ের কথা তো স্বপ্নেও ভাবতাম না।

—তাহলে বিয়ে করলে কেন?

—মেসো আর মাসতুতো তিন ভাইবোনের উপেক্ষা অপমান তিরস্কারে জর্জরিত হচ্ছিলাম বলেই মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঁচ মাস আগে নিঃশব্দে বিয়ের পিঁড়িতে বসি। বিয়ে করতে রাজি না হলে ওরা আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দিত।

—কি আশ্চর্য!

—কিচ্ছু আশ্চর্যের ব্যাপার না। তুমি তোমার রাঙাদা আর দিদিকে দেখে মনে করো না, এই পৃথিবীর সব নারী-পুরুষই উদার, মহৎ।

বেশ রুক্ষতার সঙ্গে ও বলে, জেনে রেখো, এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই নীচ, হীন, স্বার্থপর, লোভী, আত্মকেন্দ্রিক। সহায়-সম্বলহীন আশ্রয়হীন পিতৃ-মাতৃহীনকেও দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন দিতে তাদের সীমাহীন কুণ্ঠা।

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে যাইহোক, বিয়ের সময় ভেবেছিলাম, আঠারো বছর পর্যন্ত ঝাঁটা-লাথি খেয়ে মানুষ হলেও এবার আমার দিনগুলো আনন্দে

কাটবে। অন্তত একজন মানুষ আমাকে প্রাণভরে আদর করবে।

আমি অনেক আগেই উঠে বসেছি। অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি আর নিঃশব্দে কথা শুনি।

—তোমার রাঙাদাও খুব বেশিদিন মা-বাবার আদর পায়নি ঠিকই কিন্তু সে মামা-মামী-মাসীর প্রাণের দুলাল! ওদের কাছে সন্তানস্নেহে ভেসে গেছে। তাছাড়া পেয়েছে তোমাদের মত তিনটে ভাইবোন। আর আমি? না পেয়েছি সন্তানস্নেহ, না পেয়েছি ভাইবোনের ভালবাসা।

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তাইতো আমার সারা জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট অভাব মিটিয়ে নেবার স্বপ্ন নিয়ে তোমার রাঙাদার ঘর করতে এলাম।

রাঙাবৌদি আমার একটা হাত ধরে বলে, প্রথম তিনটে বছর সত্যি খুব আনন্দে কেটেছে। তার সব চাইতে বড় কারণ, তোমার দাদার মতো মহৎ প্রাণের মানুষ সত্যি দুর্লভ। এমন ভদ্র সভ্য বিনয়ী কর্তব্যপরায়ণ খুব কম হয়। সেদিন থেকে ওকে স্বামী হিসেবে পেয়ে আমি যেমন আনন্দিত, তেমনই গর্বিত।

ও একটু থেমেই বলে, তোমার ঘুম পাচ্ছে নাকি?

—না, না, তুমি বলো।

ও একটু হাসে। বলে, যখন কলকাতার তিনজন গাইনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর জানালেন, আমার সন্তানধারণ ক্ষমতা নেই, সেদিন থেকে শুরু হলো আমার নিঃসঙ্গতা। আমি মা হতে পারব না বলে স্ত্রী হবার অধিকার আর সুখ থেকে চিরদিনের মতো বঞ্চিত হলাম।

রাঙাবৌদি খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, পাপাই, আমি বাইশ বছরে পড়তে না পড়তেই বৈধব্যের স্বাদ পেলাম। তুমিই বলো, বাইশ বছরের কোন মেয়ে কি হঠাৎ তার স্বাদ-আহ্লাদ কামনা-বাসনা ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হতে পারে? শুধু শাঁখা-সিঁন্দুর মুছে দিলেই অল্পবয়সী বিধবাদের দেহ মন থেকে সব কামনা বিদায় নিতে পারে না বলেই তো বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের দাবি জানান, তাই না?

শুনে আমার মাথা ঘুরে যায়। কি করব, কি বলব, ভেবে পাই না। মনে হয় যেন বাকশক্তি হারিয়েছি।

ও হঠাৎ ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে আমার দুটো হাত ধরে বলে, পাপাই, আমি বছরের পর বছর একলা একলা রাত কাটাতে কাটাতে পাগল হয়ে গেছি। একটু আদর পাবার জন্য সারা রাত জ্বলে-পুড়ে ছটফট করে মরেছি। তাইতো তোমাকে কাছে পেয়ে আমি কাঙালের মত ছুটে এসেছি।

রাঙাবৌদি আমার বুকের পর মুখখানা রেখে কাঁদতে কাঁদতেই বলে, আমাকে

তুমি ক্ষমা করো পাপাই। ঘেন্না করে আমাকে দূরে ঠেলে দিও না।

দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে আমি বলি, আমি মুনি-ঋষিও না, পাথর না। আমি কোনদিনই তোমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারব না।

সেই অভাবনীয় দুর্যোগের রাত্রে আনন্দে খুশিতে ঝলমল করে ওঠে দুঃখিনী বঞ্চিতা রাঙাবৌদি।

ভোরবেলায় উঠে দেখি, মেঘ-বৃষ্টি তো দূরের কথা, সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে-বাইরে সর্বত্র। আর দেখি, রাঙাবৌদির সারা মুখে হাসি।

—হাসছ কেন?

—ফাঁসির আসামী যদি বেকসুর খালাস হয়ে যায়, তাহলে সে হাসবে না?

## আট

পরের দিন সওয়া এগারটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ক্লাশ ছিল বলে খেয়েদেয়েই কলেজ গেলাম। বাড়ি ফিরলাম সাড়ে তিনটে নাগাদ। বাড়িতে ঢুকেই রাঙাবৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম, কী করছিলে?

বারান্দায় পা দিয়েই ও বলে, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়ছিলাম।

রাঙাদার ঘরের সামনে দাঁড়াতেই ও জিজ্ঞেস করে, তোর আজ তিনটে পর্যন্ত ক্লাশ ছিল?

—হ্যাঁ।

—যা, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে।

—না, রাঙাদা, এখন কিছু খাবো না।

আমি আমার ঘরে আসি। রাঙাবৌদিও আসে পিছন পিছন।

—পাপাই, এখন কিছুই খাবে না?

—খিদে লাগলে তো খাব? একটু পরেই তো চা খাবো।

গায়ের জামা খুলে রেখেই ওকে বলি, মাসখানেক আগে তুমি কথায় কথায় বিদ্যাসাগরের এই জীবনীর কথা বলছিলে না?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আবার পড়ছ কেন?

—বিদ্যাসাগরের জীবনী আমি হাজার বার পড়তে পারি।

—কেন?

রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, সবার আগে বিদ্যাসাগর তারপরে বিবেকানন্দ আর শরৎ চাটুজ্যেই এ দেশের মেয়েদের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পেরেছেন। মেয়েদের জন্য এই তিনজন যা করেছেন, তা পরবর্তীকালে অন্য তিন হাজার বিখ্যাত মানুষও তা করতে পারেন নি।

আমি শরৎচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাস পড়লেও বিদ্যাসাগর আর বিবেকানন্দের বিষয়ে বিশেষ কিছুই পড়ি নি। তাই চুপ করে থাকি।

ও আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে, পাপাই, তুমি কি জানো, নিছক সম্পত্তির লোভে সদ্য বিধবাদের জোর করে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো?

—তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ও একটু মুচকি হেসে বলে, তোমরা পুরুষরা চিরকাল মেয়েদের উপর অত্যাচার করে আসছো। পুরুষরা যে কি ধাতু দিয়ে গড়া, তা আমি ভেবে পাই না।

আমিও একটু হাসি। বলি, বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-শরৎচন্দ্রও তো পুরুষ ছিলেন!

—ওরা ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। ওদের সঙ্গে সমাজের লক্ষ কোটি অন্য পুরুষদের এক আসনে বসিও না। বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ পতিতাদেরও 'মা' বলতেন আর শরৎচন্দ্র দরদ ভালবাসায় তাদের আপনজন করে নেন। ওদের সঙ্গে কি রাম-শ্যাম-যদু-মধুর তুলনা হয়?

আমি হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়েই বলি, মালতীদি লাইব্রেরী থেকে বই এনে দিয়েই তোমাকে এত পুরুষ বিদ্বেষী করে দিয়েছে।

—তা তো বটেই।

আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসতেই রাঙাবৌদি বলে, তুমি তো জানো না মালতী কেন শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে। যে হতভাগা ওকে বিয়ে করেছিল, সে আরো একটা বিয়ে করেছে স্রেফ শ্বশুরের সম্পত্তির লোভে।

—মালতীদির স্বামী আরো একটা বিয়ে করেছে?

—শুধু বিয়ে করে নি, তাকে সসম্মানে নিজেদের বাড়িতে এনেছে।

—মালতীদির শ্বশুর-শাশুড়ি তা মেনে নিলেন?

—নেবেন না? ঐ মেয়েটি যে অঢেল সম্পত্তির মালিক।

চা করতে যাবার আগে রাঙাবৌদি বলে, জানো পাপাই, প্রায় প্রতি সংসারে অন্তত একটি মেয়ে বা বউ আছে, যাকে নিত্য চোখের জল ফেলতে হয় কোন না কোন পুরুষের অবিচার বা অত্যাচারের জন্য।

মালতীদি থাকেন আমাদের গলির মোড়ের মাথার গোলাপী রং-এর একতলা বাড়িতে। ওর বাবা হাসপাতালের কম্পাউন্ডার। নিছক ভদ্রলোক। মালতীদির দাদা উত্তরপাড়ার হিন্দুস্তান মোটরের অফিসে চাকরি করেন। রাঙাবৌদির কাছেই আগে শুনেছি, বিয়ের পর আবার বাপের বাড়িতে এসে মালতীদি লেখাপড়া করে গ্রাজুয়েট হয়েছেন ও রীতিমত পরীক্ষা দিয়ে ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছে কিন্তু জানতাম না, স্বামীর কাছে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে সব অধিকার আর সম্মান হারাবার পরই উনি এখানে চলে আসেন। শুধু রাঙাবৌদি ছাড়া এ পাড়ার আর কারুর কাছে মালতীদি যান না। এই দু'জনের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব।

এখানে আসার পরদিনই আমি মালতীদিকে প্রথম দেখি। সন্ধের দিকে আমি আর রাঙাবৌদি চা-টা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ কলিং বেল বাজতেই ও বলল, এখন আবার কে এলো?

—দাঁড়াও, আমি দেখছি।

দরজা খুলতেই রাঙাবৌদির বয়সী একজন মহিলা একটু হেসে বললেন, তুমি খুকীর ভাই?

—হ্যাঁ।

উনি বাড়ির মধ্যে পা দিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, জয়ন্তী কোথায়? রান্নাঘরে?

—না, রাঙাবৌদি ঐ কোণার ঘরে।

আমার ঘরের দিকে এগুতে এগুতেই উনি বললেন, তুমি কাল এসেছ, তাই না?

—হ্যাঁ।

ওকে দেখেই রাঙাবৌদি এক গাল হেসে বলে, আয় মালতী, আয়।

মালতীদি ওর পাশে বসতেই রাঙাবৌদি আমাকে বলে, বুঝলে পাপাই, তোমার দিদি ছাড়া মালতী হচ্ছে আমার একমাত্র বন্ধু।

এবার ও মালতীদিকে বলে, নে, মুড়ি খা।

—নারে কিছু খাবো না।

—অফিস থেকে আসছিস ; কিছু খাবি না কেন?

মালতীদি একটু হেসে বলে, আমাদের ব্রাঞ্চের শীলাদির বিয়ের পঁচিশ বছর আজ পূর্ণ হচ্ছে বলে সবাইকেই অনেক কিছু খাইয়েছেন। রাত্রে খাব কিনা তাই সন্দেহ।

—চা খাবি তো?

—তা খেতে পারি।

—আমি এখুনি করে দিচ্ছি।

—ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? আগে তুই খেয়ে নে।

মালতীদিকে দেখতে নেহাতই সাধারণ ; রং চাপা কিন্তু দুটো চোখ বেশ উজ্জ্বল আর বড় বড়। ঐ দুটো চোখ আর লম্বা বিনুনিটাই ওকে যেন আকর্ষণীয়া করেছে। তবে ওর ব্যক্তিত্বই আমার সব চাইতে ভাল লাগে।

সেই প্রথম দিনই মালতীদি আমাকে বলেন, খুকী আমার বন্ধু ; সুতরাং তুমিও আমার ছোট ভাই! আমার কিন্তু আর কোন ছোট ভাই নেই।

শুনে আমি খুশির হাসি হাসি।

—মাঝে মাঝে এই দিদিকেও একটু দেখে এসো।

—হ্যাঁ, আসব।

—ঠিক তো?

আমি কিছু বলার আগেই রাঙাবৌদি বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবে ; তোর অত করে বলতে হবে না।

এর পাঁচ-সাতদিন পর আমি মালতীদির বাড়ি প্রথম যাই। অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্তের বাড়ি হলেও অত্যন্ত ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। মালতীদির ঘরে পা দিয়েই মনে হলো, এ ঘরে যিনি থাকেন, তাঁর রুচিবোধও আছে, পড়াশুনারও অভ্যাস আছে। শত খানেক বই ভর্তি একটা বুক শেলফ্। বাংলা সাহিত্যের অনেক খ্যাতনামা লেখকের অতি খ্যাত বেশ কিছু উপন্যাস ছাড়া শুধু শরৎ গ্রন্থাবলী আছে। আর আছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও গ্রাহাম গ্রীনের পাঁচ-ছ'টি উপন্যাস। তক্তাপোষের উপর শান্তিনিকেতনী সুন্দর বেডকভার দেওয়া বিছানা। ঘরের এক পাশে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের দু'টি মোড়া। খাটের এক পাশে একটা লাইট স্ট্যান্ড।

—বুঝলে পাপাই, এই ঘরখানি হচ্ছে আমার একমাত্র নিজস্ব জগৎ। সংসারের কাজে সকাল-সন্ধেয় মাকে একটু সাহায্য করা ছাড়া আমি এই ঘরের মধ্যেই থাকি।

—কোথাও বেড়াতে যান না?

—বাইরে বেড়াতে যাবার কথা বলছ?

—হ্যাঁ।

—না, আমি কোথাও বেড়াতে যাই না।

—কেন? বেড়াতে যাবার জন্য তো ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দেয়।

—হ্যাঁ, দেয় কিন্তু একলা যেতে ইচ্ছে করে না।

মালতীদের সিঁথিতে সিঁন্দুর থাকে না বলে তখন আমি ভাবতেই পারি নি, উনি বিবাহিতা।

আমি আবার প্রশ্ন করি, এই শহরে আপনার যেসব বন্ধু আছে, তাদের কাছে যান?

উনি একটু হেসে বলেন, একসঙ্গে পড়াশুনা করলেই কী বন্ধু হওয়া যায়? বিনা স্বার্থে যে ভালবাসে, যার চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মিল থাকে, শুধু সে বন্ধু হয়। তোমার রাঙাবৌদি ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নেই।

শুনে আমি একটু হাসি।

—তোমার দিদির সঙ্গেও আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব। আমি ওকে ভালবাসি, পছন্দ করি; সে-ও আমাকে খুব ভালবাসে। তোমার দিদির কথাবার্তা আমার খুবই ভাল লাগে।

আস্তে আস্তে আমি খেয়াল করলাম, দিদির মতো মালতীদিরও কোন ব্যাপারে

বাহুল্য নেই। আচার-ব্যবহার কথাবার্তা পোশাক-পরিচ্ছদ সব ব্যাপারেই রুচিসম্মত সংযম ও বাহুল্যবর্জিত। একটু মেলামেশা করলেই ওকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। সব চাইতে বিস্ময়ের কথা, আলাপ-পরিচয়ের পর মালতীদির থেকে বেশি দূরেও থাকা যায় না, আবার খুব ঘনিষ্ঠও হওয়া যায় না।

যাইহোক সেদিন রাঙাবৌদি শুধু তিন কাপ চা না, একটা প্লেটে দুটো সিঙাড়াও নিয়ে এলেন। রাঙাদার হাতে সিঙাড়ার প্লেট তুলে দিতেই ও জিজ্ঞেস করে, পাপাইকে দেবে না?

—সন্ধের পর পাপাই, আমি আর মালতী একসঙ্গে খাব। তুমি খেয়ে নাও।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই আমি রাঙাবৌদিকে জিজ্ঞেস করি, সিঙাড়া কি দোকানের নাকি তুমিই বাড়িতে করলে?

—মিষ্টি-টিষ্টি ছাড়া অন্য কোন খাবার তো আমাদের বাড়িতে আসে না।

—কী দরকার এত ঝামেলা করে সিঙাড়া তৈরি করার?

রাঙাবৌদি চাপা হাসি হেসে বলে, আমি তোমার দাদার ওয়াইফ-কাম-প্রাইভেট সেক্রেটারী-কাম-কুক-কাম-বাটলার-কাম-পার্সোন্যাল ভ্যালেট, তা জানো না?

রাঙাদা মুখ নীচু করে চাপা হাসি হাসে। মুখে কিছু বলে না।

আমাকে হাসতে দেখেই রাঙাবৌদি বলে, হাসছ কি! এর জন্য দায়ী তোমার মা আর ছোট পিসী।

—কেন?

—ওরা এমন আদর দিয়ে তোমার দাদাকে মানুষ করেছেন যে দোকানের খাবার খেলেই ওর শরীর খারাপ হয়।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলে, তাইতো ওদের আদুরে নাড়ু গোপালের জন্য সবকিছুই বাড়িতে তৈরি করি।

রাঙাদার হাসি আর থামে না।

রাঙাদা দোকানে বেরিয়ে যাবার পর আমি রাঙাবৌদিকে জিজ্ঞেস করি, তুমি এত রান্নাবান্না খাবার-দাবার তৈরি করা শিখলে কবে?

—মেসোমশায়ের কৃপায় ক্লাশ সেভেনে পড়ার সময় থেকেই আমাকে টুকটাক রান্নাবান্না করতে হতো।

—সেকি?

—হ্যাঁ, পাপাই, ঠিকই বলছি।...

জয়ন্তীকে দৌড়ে এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে দেখেই শ্রীধরবাবু স্ত্রীকে বলেন, তোমার বোনঝি আর কচি বাচ্চা নেই ; বেশ ধিড়িঙ্গী হয়েছে। সকালে না হোক সন্ধের দিকে তো ও একটু রান্নাবান্না করতে পারে। এর পর আর কবে শিখবে?

সবিতা দেবী জানেন, পতি দেবতার কথাই এ সংসারে শেষ কথা। তাছাড়া ওরই অর্থে বোনঝিকে খাওয়াচ্ছেন-পরাচ্ছেন। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দেন, এই জয়ি, এদিকে আয়।

পড়তে বসার উদ্যোগ ফেলে জয়ন্তী স্বয়ং নাদির শা'র সামনে মাসীর কাছে হাজির হয়।

—চল রান্নাঘরে। দিন দিন তো বড় হচ্ছিস। রান্নাবান্না করা শিখতে হবে না?

রাঙাবৌদি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেই শুরু। এইট ক্লাশের অ্যানুয়াল পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো, সেদিন থেকে রোজই আমাকে রাত্তিরের রান্না করতে হতো।

—পারতে?

—মাঝে মাঝেই গণ্ডগোল করতাম। কোনদিন কোনটায় নুন কম-বেশি হতো, কোনদিন কোন রান্নায় হলুদ বেশি দিয়ে ফেলতাম। সেজন্য মেসোমশাই আমাকে যথেষ্ট পুরস্কারও দিতেন।

—পুরস্কার দিতেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরস্কার। বিনুনি ধরে টেনে ফেলে দিতেন মাটিতে। তারপর কয়েকটা চড়-থাপ্পড় দিত মাসীর ছেলেমেয়েরা।

—মাসী-মেসো ওদের কিছু বলতেন না?

—মাসী বলবে? সে সাহস থাকলে তো! আর মেসোমশাই তো ওদের প্রধান ও একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন।

—চমৎকার!

—বুঝলে তো আমি কবে কিভাবে রান্না করতে শিখি?

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, নেহাত মেয়ে বলে সব অত্যাচার সহ্য করে ওখানে থেকেছি। ছেলে হলে আমি আট-দশ বছর বয়সেই মাসীর বাড়ি ছেড়ে কোন চায়ের দোকানে কাপ-ডিস ধোবার কাজ করে পেট চালাতাম। মেয়ে হয়ে জন্মালে কি কম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়।

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তোমরা পুরুষরা কোনদিন মেয়েদের দুঃখ-কষ্ট বুঝবে না।

রাঙাবৌদি বাথরুম থেকে গা-টা ধুয়ে বেরিয়ে কাপড়-চোপড় পরেই আমাকে বলল, মালতীদিকে ডেকে আনতে। তারপর আমরা তিনজনে চা-সিঙাড়া খেতে খেতে নানা কথাবার্তা বলি। পরের দিন রবিবার। আমার কলেজ নেই, মালতীদিরও ব্যাঙ্ক বন্ধ। তাইতো প্রায় সাড়ে ন'টা পর্যন্ত গল্পগুজব করে মালতীদি চলে গেল। তারপরও আমরা দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলি।

আমি খেয়ে উঠতেই রাঙাবৌদি বলল, তুমি শুতে যাও। আমি সবকিছু সেরে আসছি।

—তোমার ভয় করবে না তো?

—না, না, ভয় করবে না। তুমি যাও।

আমি ঘরে এসেই শুতে গেলাম না। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দিঘির দিকে চেয়ে থাকি। নানা কথা ভাবি। হঠাৎ রাঙাবৌদি আমার পাশে এসে কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, কি দেখছ? কি ভাবছো?

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলি, ভাবছি তোমার কথা, আমার কথা, কাল রাত্তিরের কথা।

ও মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, অত বেশি ভাববে না। বেশি ভাবলে কি লেখাপড়া কাজকর্ম দায়-দায়িত্ব ঠিকভাবে করা যায়? তাছাড়া কাল রাত্তিরে এমন কোন কেলেঙ্কারী ঘটেনি যে এত ভাবতে হবে।

একটু পরেই বলি, চল শুই ; বড্ড ঘুম পেয়েছে।

—ঘুমের আর কি দোষ? উঠেছ তো সেই সাড়ে চারটে-পৌনে পাঁচটায়।

শুতে শুতেই বলি, কী করব? অনেক দিনের অভ্যাস।

ও আমার পাশে শুয়েই বলে, আমি তোমার মাথায় মুখে হাত দিয়ে দিচ্ছি। চট করে ঘুমিয়ে পড়ো।

সত্যি আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি।

বাথরুম যাবার জন্য ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি, রাঙাবৌদি পাশে নেই। হঠাৎ মনে হয়, পাঁচটা বেজে গেল নাকি? ঘড়ি দেখি। না, পাঁচটা না, সাড়ে তিনটে বাজে। বাথরুম থেকে এসেই আমি পাশের ঘরে গিয়ে প্রায় চোরের মত নিঃশব্দে ওর পাশে শুয়ে পড়ি। ও সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে বলে, কে? পাপাই? চলে এলে কেন?

—তুমি চলে এসেছ বলেই চলে এলাম।

—এখন ক'টা বাজে?

—সাড়ে তিনটে।

ও আলতো করে আমার গায়ের উপর একটা হাত রেখে বলে, আর কথা বলো

না, ঘুমোও।

পরের দিন দুপুরে খেতে বসেই বাঙাবৌদি জিজ্ঞেস করে, কাল অত রাত্রে আমার কাছে এলে কেন?

আমি কোনমতে হাসি চেপে বলি, রাত্তিরের কথা নিয়ে অত ভাবতে নেই। অত ভাবলে লেখাপড়া কাজকর্মের ক্ষতি হবে।

ও না হেসে পারে না। বলে, এর মধ্যেই গুরু-মারা বিদ্যা শিখে ফেললে?

তখন কিছু না বললেও সেদিন রাত্তিরে শোবার পর বললাম, ঘুম ভাঙার পর তোমাকে পাশে না দেখেই থাকতে পারলাম না।

—তাই নাকি?

—সত্যি বলছি। খুব খালি খালি লাগছিল।

ও একটু হেসে বলে, এক রাত্তিরেই নেশা ধরে গেল?

—নেশা-টেশার কথা জানি না। অন্য কিছু না, শুধু তোমার কাছে শুতে ইচ্ছে করছিল বলেই তোমার কাছে গিয়েছিলাম।

—তুমি গিয়েছিলে বলে আমারও ভাল লেগেছিল ; তবে আমি কখনই চাই না, আমার জন্য তোমার কোন ক্ষতি হোক। বরং উল্টোটাই চাইব।

—তুমি কেন আমার ক্ষতি করবে?

রাঙাবৌদি সোজাসুজি বলে, দেখো পাপাই, আমি বেশ অল্প বয়স থেকেই জানি, আমার রূপ না হলেও দেহটা ছেলেদের আকর্ষণ করে। শুনলে অবাক হবে, আমার নিজের মাসতুতো দাদা আমাকে যখন-তখন গালাগালি দিত, চড়-থাপ্পড় মারতো একটি কারণে?

—ও কেন এইরকম করতো?

—তার কারণ আমি ওকে গায় হাত দিতে দিতাম না।

—এ রাম! রাম!

—রাম রাম করার কিছু নেই। মেয়েদের রূপ-যৌবন দেখে যে অনেক পুরুষকেই পাগল করে তোলে, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। শুধু আমি না, প্রত্যেকটি মেয়েই এই কথা স্বীকার করবে।

—হ্যাঁ, তা স্বীকার করি ; কারণ আমাদের কলোনীতেই এই রকম ঘটনা ঘটেছে।

—ঘটেছে বলো না ; এইসব ঘটনা আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে।

ও না থেমেই বলে, তুমি কী জানো না, হেলেন অব ট্রয় বা ক্লিও পেট্রার জন্য শত সহস্র পুরুষকে মরতে হয়েছে?

আমি চুপ।

দু' এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বাঙাবৌদি আমাকে কাছে টেনে নেয়, একটু আদর করে। তারপর বলে, যাও, তোমার ঘরে যাও। এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে। বেশি রাত করে ঘুমুলে শরীরও খারাপ হবে, ভোরবেলাতেও উঠতে পারবে না।

আমি নিঃশব্দে আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়ি।

## নয়

এইভাবেই দিন যায়।

সকালবেলাটা একটু ব্যস্ততায় কাটে। রাঙাবৌদি ব্যস্ত সংসারের কাজে, রাঙাদা চা খেতে খেতেই খবরের কাগজের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নেবার পরই চান-টান করে দোকানে যাবার জন্য তৈরি হয় আর আমাকেও ঘণ্টা দুয়েক পড়েই কলেজে যাবার জন্য উদ্যোগী হতে হয়। তবে কলেজ থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করার সময় ও তারপর আমার ঘরে শুয়ে বসে আমি আর রাঙাবৌদি কত গল্প করি।

—জানো পাপাই, বুবুনদাকে আমার খুব ভাল লাগে।...

—বুবুনদাকে আমাদেরও খুব ভাল লাগে।

—জানি ; ওকে আমি তোমাদের বাড়িতে আগে দেখেছি ও বেশ ভাল লেগেছিল কিন্তু বুবুনদাকে ভাল করে চিনলাম, জানলাম গত বছর।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, গত বছর স্টেট ব্যাঙ্কের এখানকার ম্যানেজার অসুস্থতার জন্য দু'বার ছুটিতে গেলে বুবুনদাই তো এখানে ম্যানেজারের কাজ করেছে।

—হ্যাঁ ; খুকীর কথা মতো ও ছিল আমাদের কাছেই।

—জানি।

না থেমেই একটু হেসে বলি, এখান থেকে ফিরে গিয়ে ও যখন তোমাদের আন্তরিকতার প্রশংসা করে, তখন মা কি বলেছিলেন জানো?

—কী বলেছিলেন?

—মা বলেছিলেন, বুবুন, ভুলে যেও না, সবদিক থেকেই রাঙা আমার প্রথম সন্তান আর রাঙাবৌমা তো সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তারা তোমাকে আদর যত্ন করেছে বলে তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

রাঙাবৌদি খুশির হাসি হেসে বলে, আমি জানি পাপাই, ওরা তোমার দাদাকে কি চোখে দেখেন। তাছাড়া উনি খুকীকে যেমন স্নেহ করেন, আমাকেও ঠিক ঐরকমই স্নেহ করেন, ভালবাসেন।

ও একটু থেমে বলে, ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি কিন্তু বিয়ের পর আমি দু'-দু'টো মা পেলাম। তোমার ছোট পিসীও আমাকে সন্তানজ্ঞানেই স্নেহ করেন।

'দাঁড়াও আসছি' বলে রাঙাবৌদি ওর ঘর থেকে একটা খাম হাতে করে আমার ঘরে এসে হাসতে হাসতে বলে, বুবুনদা এখানে আসার আগে খুকী আমাকে একটা

চিঠি লিখেছিল। সেই চিঠিটা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।... প্রিয় রাঙাবৌদি, তোমাদের ওখানকার স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের স্ত্রী খুবই অসুস্থা। স্ত্রীকে কলকাতায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাবার জন্য উনি দশ দিনের ছুটি নিচ্ছেন বলে স্টেট ব্যাঙ্কের বড়কর্তারা তোমাদের বুবুনদাকে ওখানে পাঠাচ্ছেন অস্থায়ী ম্যানেজারের দায়িত্ব নিতে। আমাদের দাদা-বৌদি থাকতে বুবুনদা হোটেলে বা ব্যাঙ্কের অন্য কোন অফিসারের বাড়ি থাকবে, তা কখনই হতে পারে না। তবে তার চাইতে বড় কথা ও অন্য কোথাও থাকলে আমি শান্তি পাবো না। তুমি জানো বুবুনদা আমার জন্মজন্মান্তরের পরম কাম্য, পরম প্রিয়, পরম শ্রদ্ধেয় আপনজন—আমার একান্ত নিজস্ব আপনজন। আমার মানসলোকের নিভৃত দেবালয়ের চিরপূজ্য বিগ্রহ। ও আমার জীবনের রূপকার, সুরকার, পরিচালক। শুধু ওরই জন্য আমি জীবনযুদ্ধে হেরে যাই নি। হারিয়ে যাই নি। আমি ভাল কি মন্দ, তা জানি না কিন্তু যা হয়েছি, তার সবটুকু কৃতিত্ব বুবুনদার। আমার এই জীবনদেবতাকে তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে রেখে শান্তি পাবো?

হ্যাঁ, বুবুনদা আঠারই সকাল এগারটা-সাড়ে এগারটার মধ্যে তোমাদের ওখানে পৌঁছবে। ওকে পরদিনই ওখানে জয়েন করতে হবে। বোধহয় ঊনত্রিশে বিকেলে বা পরদিন সকালে ফিরবে।...

চিঠিটা পড়া শেষ হতেই আমি বলি, দিদি কি সুন্দর চিঠি লিখতে পারে।

—হ্যাঁ, ওর প্রত্যেকটা চিঠিই অপূর্ব। ওর এক একটা চিঠি যে কতবার পড়ি, তার ঠিকঠিকানা নেই।

—দিদি কি তোমাকে নিয়মিত চিঠি লেখে?

—খুব নিয়মিত না, তবে মাঝে মাঝেই লেখে।

রাঙাবৌদি একটু থেমে বলে, খুকী তো ওর দাদাকেও মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। সেই সব চিঠি ও যে কতজনকে পড়ায়, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, তোমার দাদাকে লেখা খুকীর চিঠিগুলো পড়লেই বুঝা যায়, এই দুই ভাই-বোনের মধ্যে কি গভীর স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক। সত্যি বলছি পাপাই, ওদের দু'জনের ভাব-ভালবাসা দেখে আমার মন খুশিতে ভরে যায়।

আমি একটু হেসে বলি, দিদি আর রাঙাদার সম্পর্ক যে ভেরি স্পেশ্যাল, তা আমরা খুব ভাল করেই জানি। যাইহোক বুবুনদার কথা বলো।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর ও বলে, বুবুনদা যেদিন আসে, সেদিন কি

কারণে যেন বাজার বন্ধ থাকায় তোমার দাদাও বাড়িতে ছিল। বুবুনদা বাড়িতে পা দিয়েই তোমার দাদাকে প্রণাম করার পরই আমাকে প্রণাম করতে এলো। আমি অনেক বাধা দিয়েও ওকে ঠেকাতে পারলাম না।

ও না থেমেই বলে, বুবুনদা আমাকে প্রণাম করেই আমাকে কি বলল জানো?

—কি বলল?

—বলল, খুকী তোমাকে আর রাঙাদাকে কি চোখে দেখে, তা আমি খুব ভাল করেই জানি। খুকীর কাছে রাঙাদা তো দেবতা। তুমি হচ্ছো ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও হিতৈষিণী ; তাছাড়া প্রাণের বৌদি। তোমাকে প্রণাম করব না, তাই কখনো হয়?

—বুবুনদা যেমন ভদ্র-সভ্য, সেইরকমই ছোটদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, বড়দের শ্রদ্ধা করে। বুবুনদা ইজ বুবুনদা।

—তুমি শুনলে অবাক হবে, ও রোজ ব্যাঙ্ক থেকে তোমার দাদার দোকানে গিয়ে ক্যাশ মেমো লিখতো, ক্যাশ সামলাতো।

আমি বিস্মিত হয়ে বলি, তাই নাকি?

—শুধু কি তাই?

রাঙাবৌদি হাসতে হাসতে বলে, ও আমাকেও কত কাজে সাহায্য করতো।

ও একটু থেমে বলে, দু'-দু'বার বুবুনদাকে খুব কাছ থেকে দেখে আর মেলামেশা করে দেখলাম, সত্যি একটা আদর্শবান মানুষ। খুকীর মত মেয়ের জন্য একেবারে ষোল আনা উপযুক্ত ছেলে।

ও একটু হেসে বলে, যাকে বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলে 'মেড ফর ইচ আদার'।

ইদানীং প্রায় রোজই বৃষ্টি হলেও ঠিক বর্ষার বৃষ্টি হয়নি। সোমবার সকালে রোদ্দুরের মধ্যেই কলেজ গেলাম কিন্তু তারপর পরই মেঘে ঢেকে গেল সূর্য। বারোটা নাগাদ শুরু হলো বৃষ্টি আর মেঘের গর্জন। তবে তেমন জোরে না। দুটো নাগাদ কাক ভেজা ভিজে বাড়ি ফিরলাম। ভেজা জামা-প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা-গেঞ্জি পরে বাথরুম থেকে বেরুতেই দেখি, অসম্ভব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। বিকেলের মধ্যেই আমাদের উঠোনে আর আমাদের গলিতে জল জমতে শুরু করলো। ওরই মধ্যে রাঙাদা ধুতি-পাঞ্জাবি গুটিয়ে সামনে ছাতি ধরে রিক্সায় দোকান গেলেন। তবে যাবার আগে রাঙাবৌদিকে বললেন, যদি এইরকমই বৃষ্টি হয়, তাহলে আর হরিপদকে পাঠাব না। ঘোষদের দোকান থেকে দই-মিষ্টি এনে খাব।

—অন্য কিছু খেও না।

—না, না, অন্য কিছু খাবো না।

আমি বললাম, রাঙাদা ঠিক ভিজে যাবে। ঐ ভিজে...

—দোকানে তোমার দাদার দুটো করে ধুতি-টুতি সবকিছু রাখা আছে। দরকার হলে ঐসব পরতে পারবে।

—রাঙাদা যে বুদ্ধি করে দোকানে দু' সেট করে ধুতি-পাঞ্জাবি রেখে...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও একটু হেসে বলে, তোমার দাদার বুদ্ধিতে না, এই অপদার্থ জয়ন্তী দেবীই জোর করে দোকানে জামা-টামা রেখে দিয়েছে।

—গুড! ভেরি গুড!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতেই আমাদের কথা হয়। হঠাৎ বিকট আওয়াজ করে বজ্রপাতের আওয়াজ হতেই রাঙাবৌদি 'ও মা!' বলে চিৎকার করেই আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি ওকে ঘরে নিয়ে আসি।

ঘরে আসার পর একটু-আধটু মেঘের গর্জন চলতে থাকলেও তেমন জোরে হয় না। আমি বলি, আর বোধহয় তেমনভাবে মেঘের ডাক হবে না।

—বাঁচা যায় তাহলে!

—এখন কি বেশি কিছু রান্না করতে হবে?

—শুধু রুটি করতে হবে।

—তাহলে এখনই রুটিগুলো করে রাখো ; পরে যদি আবার...

—হ্যাঁ, যাচ্ছি।

—আমি কি আসব?

—হ্যাঁ, এসো। ওখানে বসে চা-টা খেয়ে এসেই পড়তে বসো।

আমরা যখন চা-টা খাচ্ছি, তখন থেকেই আবার শুরু হলো বিকট মেঘের গর্জন। রাঙাবৌদি আমাকে আঁকড়ে ধরে ; মেঘের গর্জন কমলে ছেড়ে দেয়।

—পাপাই, তুমি এখন এখানেই থাকো। আমি চটপট রুটি করে নিই।

—হ্যাঁ, আমি আছি।

ও রুটি করতে শুরু করে। মেঘের গর্জন জোরে হলেই আমাকে জড়িয়ে ধরে, থামলে ছেড়ে দেয়, রুটি করে। এইভাবেই ওর কাজ শেষ হলে আমরা ঘরে আসি কিন্তু ততক্ষণে উঠোনে বেশ জল জমে গেছে।

আমার বিছানায় বসেই রাঙাবৌদি বলে, জানো পাপাই, এখানে বেশি বর্ষা হলেই ঘর-বাড়িতে সাপ ঢুকে পরে।

সাপ আসে শুনেই আমি আঁতকে উঠি। চিড়িয়াখানায় সাপ দেখেই আমার মনে হয়, যদি কোনক্রমে বেরিয়ে এসে ওরা কামড়ে দেয়! পথেঘাটে বা বাড়িতে আমি

কোনদিন সাপ দেখি নি ; দেখতে চাইও না। খবরের কাগজে পড়েছি, অনেক সাপেরই বিষ নেই কিন্তু কোন সাপে বিষ আছে বা নেই, তা জানব কেমন করে? তাছাড়া সাপ দেখলেই তো ভয় করে। একবার কয়েকজন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একটা অদ্ভুত মানুষকে দেখতে গিয়েছিলাম। রীতিমত টিকিট কেটে দেখেছিলাম, লোকটা সারা শরীরে দশ-বারোটা কেউটে-গোখরো সাপ নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। নন্দ হাসতে হাসতে বলেছিল, দেখছি, এ তো কলির মহাদেব! আমি বলেছিলাম, চুপ কর। মহাদেব না ঘোড়ার ডিম! লোকটা যমদূতের বাবা!

এখন রাঙাবৌদির কাছে সাপের কথা শুনেই আমার মুখ শুকিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করি, সত্যি এখানে সাপ বেরোয়?

—তবে কি আমি তোমাকে মিথ্যে বলছি? দু'বছর আগে এইরকমই এক বর্ষার দিনে মালতীর ঘরে সাপ ঢুকেছিল।

—তারপর?

—মালতী বুদ্ধি করে নিজের বিছানার তোষকটা সাপটার উপর ফেলে দিয়েই চিৎকার শুরু করে।

—তারপর?

—ওর চিৎকার শুনেই সামনের বাড়ির দিলীপবাবু ছুটে এসে পিটিয়ে সাপটাকে মেরে ফেলেন।

—ঐ ভদ্রলোক তো বেশ সাহসী।

—উনি পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ; বেশ সাহসী লোক।

—ওটা কি বিষাক্ত সাপ ছিল?

—পরে দেখা গেল, ওটা কেউটে ছিল তবে মাঝরি সাইজের।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, সেই রাতটা মালতী আর ওর বাবা-মা তো আমাদের বাড়িতেই থাকেন।

আমি জিজ্ঞেস করি, তোমাদের এই বাড়িতে কখনও সাপ ঢুকেছে?

—বছর পাঁচেক আগে একবার তোমার দাদা ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে বারান্দায় একটা সাপ দেখেই দরজার খিল দিয়ে মারে। সাপটা বেশ মারাত্মকভাবে জখম হলেও তখন কি ভীষণ ফোঁশ ফোঁশ করছিল।

—তারপর?

—ঠিক সেই সময় দোকানের এক কর্মচারী এসে হাজির। সে সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা পুরনো শাড়ি কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়েই সাপটার উপর ফেলে দেয়।

—সাপটা মরেছিল?

—হ্যাঁ, পুড়ে মরে গিয়েছিল।

—এ তো এক অদ্ভুত দুঃশ্চিন্তার কথা বললে।

—আমি বলছি না সাপ আসবেই, কিন্তু আসতে পারে।

বৃষ্টি তো সমানতালেই চলছিল। ন'টা নাগাদ শুরু হলো ঝড়ের মাতলামী। মাঝে মাঝেই গাছপালা ভেঙে পড়ার আওয়াজ। এছাড়া মিনিটে মিনিটে মেঘের বিকট গর্জন। রাঙাবৌদি চিৎকার করে, আমাকে জড়িয়ে ধরে ; ভয়ে-আতঙ্কে ওর মুখ শুকিয়ে যায়। ঘণ্টা খানেক পর বৃষ্টি কমতে শুরু করে, মেঘেরাও বোধহয় গর্জন করতে করতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। সাড়ে দশটার পর পরই সবকিছু একেবারে থেমে যায়। আমরা খাই। বাড়ির সব দরজায় তালা লাগানো হয়। আমি চলে যাই আমার ঘরে, রাঙাবৌদি শোয় ওর ঘরে। ঠিক এইভাবেই গত দিন দশেক চলছে।

শোবার পরও ঘুম এলো না। রাঙাবৌদির কথাই চিন্তা করি। মনে হলো, তুমুল বর্ষণ আর ঘন ঘন মেঘের গর্জন যেমন হঠাৎ থেমে যায়, ওর চাঞ্চল্য, নিঃসঙ্গ রাত্রিযাপনের দুঃখ-কষ্ট-জ্বালাও ঠিক তেমনি যেন অকস্মাৎ দূর হয়েছে।

আবার ভাবি, ও কি কোন কারণে আমার উপর অসন্তুষ্ট? নাকি আমাকে ঠিক পছন্দ করছে না?

আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তবে যদি ও কোন কারণে আমাকে অপছন্দ করে, তাহলে তো এখানে থেকে পড়াশুনা করা উচিত না ; যে কোন অছিলায় আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। যাবোই। কিন্তু না, আমি বাড়ি ফিরব না। অন্য কোথাও চলে যাব যেভাবেই হোক একটা কাজ জোগাড় করব। আয় না করা পর্যন্ত আমি বাবার সামনে যাবো না। কখনই না।

রাত্রি এমনই নিঝুম নিঃস্তব্ধ যে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি। বিচিত্র অস্বস্তি নিয়ে আর শুয়ে থাকতে পারি না। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে থাকি। তারপর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে দিঘির দিকে চেয়ে থাকি। দ্বিধা দ্বন্দ্ব বিষণ্ণতায় মন ভরে যায়।

হঠাৎ রাঙাবৌদি আলতো করে একটা হাত ধরতেই চমকে উঠি। ও বলে, শুতে এসো।

আমি কোন কথা না বলে শুয়ে পড়ি। ও আমার পাশে শুয়েই আমাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, ঘুমোওনি কেন?

—ঘুম আসছিল না।

—কেন?

—ভাল লাগছিল না।

—কেন ভাল লাগছিল না?

—এমনি।

—ভাললাগারও কারণ থাকে, ভাল না লাগারও কারণ থাকবেই।

আমি কিছু বলতে পারি না; চুপ করে থাকি। বেশ কিছুক্ষণ কেউই কোন কথা বলি না। তারপর আমি জিজ্ঞেস করি, তুমি ঘুমোওনি কেন?

—তুমি ঘুমোওনি বলে।

—কী করে জানলে আমি ঘুমোইনি?

—আমি তো অনেকবার দরজার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে তোমাকে দেখে গেছি।

—আমি তো অনেকক্ষণ শুয়েছিলাম। কি করে বুঝলে আমি ঘুমোইনি?

আমি বুঝতে পারি, ও একটু চাপা হাসি হাসে। বলে, ঘুমুলে কি তুমি এত হাত-পা নাড়াও? মিনিটে মিনিটে এপাশ-ওপাশ করো?

আমি কি জবাব দেব? বুঝলাম, সত্যি ও আমাকে দেখে গেছে।

—একটু আগে তো দশ-পনের মিনিট চেয়ারে বসেছিলে। কী ঠিক বলছি?

—হ্যাঁ।

একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলি, যখন দেখলে আমি ঘুমোই নি, ঘুমুতে পারছি না, তখন আগে এলে না কেন?

—আশা করছিলাম তুমিই আমার কাছে আসবে।

—সত্যিই আশা করছিলে?

—হ্যাঁ; তুমি এলে না কেন?

—মনে হলো, তুমি হয়তো অপছন্দ করবে, রাগ করবে।

—কি করে ভাবলে আমি অপছন্দ বা রাগ করবো? হাজার হোক তুমি পড়াশোনা করছো। আমি যদি তোমাকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করি, তাহলে কি ভাল হবে?

—বেশি মাতামাতি কেন করবে? তুমি দু' চারদিন অন্তর দু' পাঁচ মিনিটের জন্য আমাকে তোমার কাছে থাকতে দিলেই আমি খুশি হবো। এর বেশি আমি চাই না।

রাঙাবৌদি আমার মুখের উপর মুখখানা রেখে আপনমনেই বলে, আচ্ছা পাগলা ছেলের পাল্লায় পড়েছি।

আমি দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলি, সত্যি বলছি, তুমি একটু কাছে এলেই আমার সব দুঃখ অভিমান চলে যায়। যাও, এবার শুতে যাও।

—একবার ঘড়িটা দেখবে?

আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখেই চমকে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে আলো অফ করি।

ও জিজ্ঞেস করল, ক'টা বাজে?

আমি ওর কানে কানে বলি, মোটে সাড়ে চারটে।

—সাড়ে চারটে!

—হ্যাঁ, সাড়ে চারটে।

—তাহলে আর ঘুমিয়ে কি হবে?

—একটুও ঘুমুবে না?

—এখন ঘুমুলে কি তোমার দাদা আসার আগে আমাদের ঘুম ভাঙ্গবে?

ও নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দেয়, এইটুকু সময় ঘুমিয়ে কি হবে? এসো, আমরা গল্প করেই কাটিয়ে দিই।

—সেই ভাল।

আমি শুতেই ও জিজ্ঞেস করে, রাত জাগা তোমার অভ্যাস আছে?

—না।

—এর আগে রাত জেগেছ?

—বছর তিনেক আগে আমাদের কলোনীর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দাহ করতে গিয়ে রাত আড়াইটের সময় বাড়ি ফিরি। সারা রাত কখনো জাগি নি।

—কোনকালেই একটা রাতও জাগো নি?

—না।

ও একটু হেসে বলে, তাহলে আজই তোমার প্রথম রাত জাগা?

—হ্যাঁ।

—আজকের রাত্তিরের কথা মনে থাকবে?

—নিশ্চয়ই।

—চিরকাল?

—হ্যাঁ, চিরকাল।

—তুমি যাতে ভুলে না যাও সেইজন্য...

কথাটা শেষ না করেই ও আমার সারা মুখে আর ঠোঁটে চুমু খায়।

ও উপুড় হয়ে শুয়ে আমার মুখের দিকে তাকাতেই দেখি, ভোরের আবছা আলো এসে লেগেছে ওর মুখে। আমি ওর মুখখানা কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়েই বলি, এমন রাত জীবনে বোধহয় একবারই আসে, তাই না?

ও কিছু বলে না। শুধু চোখে মুখে খুশির আভা ঝরিয়ে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আমিও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওকে দেখি।

## দশ

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। স্বীকার করতেই হবে, এই একটি বছর আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। বিপ্লব ঘটে গেল আমার চিন্তা-ভাবনায়-দৃষ্টিভঙ্গীতে।

রাঙাদা আমাদের তিন ভাইবোনের কাছে একটা অমলিন আদর্শ। কিন্তু একটা বছর খুব কাছ থেকে দেখে বুঝেছি, রাঙাদা এই মাটির পৃথিবীতে সত্যি এক দেবতুল্য মানুষ। স্নেহ ভালবাসা কর্তব্যের প্রতিমূর্তি। তাঁর কামনাও নেই, বাসনাও নেই ; সে দাবিও করে না, প্রত্যাশাও করে না। সর্বোপরি তাঁর সংযম।

আমাদের এই পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় কিছু রক্ত-মাংসের মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা জয় করেছেন দেহ-মনের সব রিপুকে। এঁরা ব্যতিক্রম, এঁরা নমস্য, প্রণম্য, চিরপূজ্য। এঁরা ক্ষণজন্মা। মানব ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণেই তাঁরা আসেন এই মর্তভূমিতে। কিন্তু সাধারণ মানুষ? যারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়, যাদের দেহের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে কত অসংখ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা-লালসা, রাগ আর ঘৃণা, তারাই তো ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তাদের নিয়েই গড়ে উঠেছে সমাজ সংসার। পৃথিবীর সব জীবেরই মধ্যে আছে কম-বেশি এইসব দোষ-গুণ।

আর রাঙাদা?

সে সংসারের আর পাঁচজনের মতই একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু অভাবনীয় তাঁর সংযম!

একদিন তো রাঙাবৌদি কথায় কথায় বললেন, আঠারো বছর বয়সে বিয়ে হবার আগে যাদের দেখেছি, জেনেছি, বিয়ের পর দেখলাম তোমার দাদা ঠিক তার বিপরীত।

—বিপরীত মানে?

—দেখ পাপাই, আমাদের সবার মধ্যেই কিছু না কিছু লোভ, আসক্তি আছে। থাকবেই। আপামর সাধারণ মানুষের এটাই স্বাভাবিক, প্রত্যাশিতও। আমাদের প্রত্যেকেই এটা-ওটা খেতে চাই, পেতে চাই, উপভোগ করতে চাই।

—হ্যাঁ, তাইতো।

—পাপাই, এটাই স্বাভাবিক, এটাই মানুষের ধর্ম কিন্তু তোমার দাদা একদিনের জন্যও আমাকে বলেন নি, এটা খেতে চাই, ওটা একদিন করবে। খেতে বসেও

কোনদিন বলে না, এটা একটু দাও বা ওটা একটু দাও।

ও একটু থেমে বলে, তোমাকে আমার জীবনের চরম গোপন কথা বলেছি বলেই বলছি, আমার দেহের প্রতিও ওর কোন আকর্ষণ কোনদিন দেখলাম না।

সত্যিই রাঙাদা যেন নির্বিকার শিব! ভোলানাথ!

রাঙাবৌদিও একটি বিস্ময়।

নিছক সাধারণ একজন ব্যবসাদারের সে স্ত্রী। শুধু সুন্দরী ও যুবতী না, আকর্ষণীয়া। ওর বিদ্যুৎ চাহনি, মুখের হাসি, দেহ লাবণ্য অন্যের দৃষ্টি টেনে নেয়, নেবেই। ওকে দেখে চট করে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেওয়া কষ্টকর। বি. এ-এম. এ. তো দূরের কথা, সে স্কুলের শেষ গণ্ডী পার হবার কৃতিত্বও অর্জন করে নি কিন্তু তাহলে কি হয়! সে অনেক কিছু জানে, বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে। কথাবার্তা চলা-ফেরায়, কাজকর্মে, দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আছে রুচি, আছে মাধুর্য। আর সর্বোপরি আছে জীবনবোধ। দূর থেকে রক্তবর্ণ পলাশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও গন্ধে মাধুর্যে চাঁপা-চামেলী-জুঁই বা রজনীগন্ধা-গোলাপ আমাদের চিত্ত জয় করে। যে নারীর রূপ আছে কিন্তু মাধুর্য নেই, সে পলাশের মত দৃষ্টি টেনে নিলেও চিত্তে স্থায়ী আসন বিছিয়ে বসতে পারে না। এ সংসারে চলার পথে আমরা কতই সুন্দরী দেখতে পাই কিন্তু মাধুর্যময়ীর দেখা পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। সে দিক থেকে আমি সত্যি সৌভাগ্যের অধিকারী। দিদি আর রাঙাবৌদিই আমাকে ভরিয়ে দিয়েছে তাদের হৃদয়-মাধুর্যে।

হাজার হোক আমি রক্ত-মাংসের মানুষ। এই পৃথিবীর কাউকে বলতে না পারলেও আমি মনে মনে জানি, প্রথম দর্শনেই রাঙাবৌদিকে দেখে আমি শুধু মুগ্ধ না, বোধহয় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি। দিবারাত্র তার সান্নিধ্য, গন্ধ, স্পর্শ, তার কথাবার্তা, হাসি আমার মন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংস্কার কোন মতে আমাকে সংযত করে রেখেছে। তারপর একদিন রাঙাবৌদির চোখে আমার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

এই এক বছরে আমি সত্যি বদলে গেলাম। বদলে গেল আমার দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা ; কেটে গেল আমার নেশা। তবে না, এসব হঠাৎ ঘটেনি। ঘটেছে ধীরে ধীরে। এক একদিনের বিশেষ ঘটনার জন্য।

সেদিন শেষ রাত্তির থেকেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো। পরদিন সকালে রাঙাদা আর আমি যখন কলেজে বেরুলাম, তখন বৃষ্টির তেজ কমলেও বন্ধ হয়নি। কিন্তু দুপুরের পরই শুরু হলো তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। নেহাত রাঙাবৌদি আমার সঙ্গে খাবে বলে

অপেক্ষা করছে, তাই বাধ্য হয়েই ওরই মধ্যে কলেজ থেকে রওনা হলাম। ঝোড়ো হাওয়ার জন্য ছাতি খুলেই বন্ধ করতে হয়। ভিজে ঢোল হয়ে বাড়ি ফিরলাম। প্রথমে একবার জোরে, তারপর পর পর দু'বার কলিংবেল বাজাবার পরও রাঙাবৌদি দরজা না খোলায় অবাক হই। তাছাড়া ঐ বৃষ্টির মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ কষ্ট হয়। তাইতো আবার খুব জোরে বেল বাজাই। মিনিট খানেক পরই দরজা খুলে যেতেই রাঙাবৌদিকে জবজবে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আমার মাথায় ভূত চাপে। আমি দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরি।

ও সঙ্গে সঙ্গেই আমার দুটো হাত টেনে বলে, পাপাই, প্লীজ ছেড়ে দাও। আমি চান করতে করতে তোমার বেল শুনে ছুটে এসেছি।

কি জানি কেন, আমি কিছুতেই ওর অবাধ্য হতে পারি না। আমি দুটো হাত টেনে নিতেই ও দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ে। আমিও পা বাড়াই আমার ঘরের দিকে।

বেলা একটু গড়াতে না গড়াতেই বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশে কালো মেঘের ছিটে-ফোটাও রইল না বিকেলে। সন্ধের পরই চাঁদের আলোয় ভেসে গেল চারদিক।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরই আমরা পাশাপাশি বসে কথা বলি। হঠাৎ কথায় কথায় রাঙাবৌদি বলল, আচ্ছা পাপাই, তুমি বুবুনদাকে খুব ভালবাসো, তাই না?

—একশ' বার ভালবাসি।

—ওকে শ্রদ্ধা করো?

—করি বৈকি।

—কেন শ্রদ্ধা করো?

—ওর শিক্ষা-দীক্ষা স্বভাব-চরিত্র কর্তব্যজ্ঞান জেনে দেখে ভাল লেগেছে বলেই বুবুনদাকে শ্রদ্ধা করি।

—আমি কেন ওকে শ্রদ্ধা করি, তা জানো?

—ঠিক কারণটা না জানলেও মনে হয় আমি ওর যেসব গুণের জন্য শ্রদ্ধা করি, তুমিও সেইজন্যই...

রাঙাবৌদি বেশ স্পষ্ট করে বলে, না। আমি ওকে শ্রদ্ধা করি, ওর সংযমের জন্য।

ও মুহূর্তের জন্য না থেমেই আমার চোখের পর চোখ রেখে বলে, তুমি কী জানো, বুবুনদা আজ পর্যন্ত খুকীর একটা হাতও ধরেনি?

শুনে আমি সত্যি অবাক হই। বলি, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, সত্যি তাই।

ও একটু হেসে বলে, পাপাই, যে ভালবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধা আর কল্যাণ চিন্তা নেই, তা ভালবাসাই না ; সে শুধু কামনার প্রকাশ।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

—বুবুনদা খুকীকে শুধু প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাসে না, ওর গুণের জন্য শ্রদ্ধাও করে। তাছাড়া সবসময় খুকীর কল্যাণ চিন্তা করে বলেই বুবুনদা এত সংযমী।

ও আবার একটু হেসে বলে, ভবিষ্যতে সারাজীবন ধরে হেসে খেলে আনন্দে থাকবে বলেই আজকের সব তুচ্ছ আনন্দ ওরা জমিয়ে রাখছে ভবিষ্যতের জন্য।

ওর কথা শুনে আমি মনে মনে দিদি আর বুবুনদাকে প্রণাম করি।

রাঙাবৌদি দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বলে, তুমি একটু সংযমী হতে পারো না? তোমার হাতে একটা চাবি দিয়েছি বলেই কী যখন-তখন যা খুশি লুঠ করতে হবে?

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর আমি শুধু মাথা নেড়ে বলি, না।

সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে আমি সাধু হয়ে গেলাম, তা নয় কিন্তু নিশ্চয়ই অনেক সংযমী হলাম, উচ্ছ্বাসে যখন তখন ভেসে যাই না। এর পরও আমরা মাঝে মাঝেই পাশাপাশি শুই, গল্পগুজব করি।

—আচ্ছা রাঙাবৌদি, তুমি তো পরের বাড়ির ভাত খেয়ে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বড় হয়েছ কিন্তু নাচ শিখলে কী করে? তোমার মাসীই কি তোমাকে নাচের ক্লাশে ভর্তি করে দেন?

—পাপাই, একটা চিরসত্য জেনে রাখো। চির দুঃখী বা ঘৃণ্য মানুষকেও এই পৃথিবীর কেউ না কেউ ভালবাসবেই। শিপ্রা মাসীর জন্যই আমি নাচ শিখতে পারি। ওরা আমাকে খুব ভালবাসতেন।

—কে শিপ্রা মাসী?

—আমার মাসীর বাড়ির ঠিক পাশেই থাকতেন শিপ্রা মাসীরা। ওর স্বামী মালদা কলেজের প্রফেসর ছিলেন। শিপ্রা মাসী নিজেও আমাদের স্কুলেই নাচের টিচার ছিলেন। ওদের এক মাত্র সন্তান আঁখি আমার সঙ্গে শুধু পড়তো না, ও ছিল আমার একমাত্র বন্ধু।

রাঙাবৌদি একটু থেমে বলে, আঁখি সুন্দরী তো ছিলই কিন্তু সব চাইতে সুন্দর ছিল ওর দুটো চোখ। মনে হতো যেন স্বয়ং ভগবান নিজে তুলি দিয়ে এঁকেছিলেন ওর ঐ দুটো চোখ। ঘন কালো আঁখিপল্লব ছিল বলে ওর চোখ দুটোকে আরো বেশি সুন্দর দেখাতো। এক কথায় অপূর্ব!

আমি একটু হাসি।

—খুব অল্প বয়স থেকেই আঁখি নাচ শিখতো ওর মায়ের কাছে। আঁখির সঙ্গে

বন্ধুত্ব হবার পর আমিও ওর নাচ শেখা দেখতাম দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। তারপর একদিন...

শিপ্রা দেবী জয়ন্তীকে বললেন, কাছে আয়।

ও কাছে যেতেই উনি একটু হেসে বলেন. তোকে দেখতে এত ভাল, তোর চোখ দুটো সুন্দর তোর নাচ শিখতে ইচ্ছে করে না?

জয়ন্তী সরাসরি জবাব দিতে পারে না। দেবে কী করে? ও তো জানে, শিপ্রা মাসী টাকা নিয়ে মেয়েদের নাচ শেখান কিন্তু ও নাচ শিখতে চাইলে কে টাকা দেবে?

--তুই আমার কাছে নাচ শিখবি?

হঠাৎ সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে ও বলে, মাসী-মেসো তো নাচ শেখার জন্য একটা পয়সাও দেবে না।

শিপ্রা দেবী ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, ওরে পাগলী! তুই যখন আঁখির প্রিয় বন্ধু, তখন তুইও তো আমার একটা মেয়ে। তোকে নাচ শেখাবার জন্য কি আমি টাকা নিতে পারি?

ছোট্ট জয়ন্তী, এক গাল হাসে।

—শোন জয়ন্তী, আমি তোকে যা দেখিয়ে দেব, সেগুলো প্র্যাকটিশ করার সময় আঁখি তোকে হেলপ্ করবে।

জয়ন্তী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।...

রাঙাবৌদি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে. শিপ্রা মাসীর জন্যই আমি নাচ শিখতে পারি ; তবে আঁখিও আমাকে খুব সাহায্য করেছে।

ফাংশানে নাচতে?

—আঁখি ছ'-সাত বছর বয়স থেকেই স্কুলের নানা অনুষ্ঠানে নাচতো। ও যখন ক্লাশ সেভেন-এইটে পড়ে, তখন ওর নাচ দেখার জন্য কি ভীড় হতো, তা ভাবতে পারবে না। ক্লাশ নাইনে ওঠার পরই আমি আর আঁখি এক সঙ্গে নাচি রেড ক্রশের এক অনুষ্ঠানে।

ও একটু হেসে বলে, আমাদের নাচের পর হাততালি আর থামতে চায় না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

ও না থেমেই বলে, রেড ক্রশের ঐ অনুষ্ঠানের পর আঁখির মত আমার নামও ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। শহরের যে কোন ভাল অনুষ্ঠানেই আমাদের ডাক

পড়তে শুরু করলো।

—তোমার মাসীর বাড়ির কেউ আপত্তি বা রাগ করতো না?

—আমার মাসতুতো বোন মনে মনে খুব হিংসা করলেও কিছু বলতে পারতো না।

—কেন?

—মেসো চাকরি করতেন কালেক্টরীতে। স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমার নাচের প্রশংসা করেছিলেন বলে মেসো ওকে বলেছিলেন, স্যার, জয়ন্তী আমার শালীর মেয়ে হলেও আমিই ওকে মানুষ করছি।

—তুমি কি শুধু গানের সঙ্গেই নাচতে নাকি নৃত্যনাট্যতেও নেচেছ?

রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, শ্যামা আর চিত্রাঙ্গদা করেই আমার আর আঁখির খুব নাম হয়। চিত্রাঙ্গদায় আমি হতাম চিত্রাঙ্গদা আর আঁখি হতো অর্জুন।

—আর শ্যামায়?

—ও হতো বজ্রসেন আর আমি শ্যামা।

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ঐ দিনগুলোই ছিল আমার জীবনের সব চাইতে আনন্দের দিন। শুধু ঐ নাচের সময়ই আমি আমার সব দুঃখ ভুলে যেতাম।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর আমি বলি, তোমার নাচ দেখে নিশ্চয়ই অনেক ছেলে প্রেমে পড়েছিল?

—অনেকে প্রেমে পড়েছিল কিনা বলতে পারবো না ; তবে দু'তিনটে ছেলে স্কুলের মেয়েদের হাত দিয়ে প্রেম পত্র পাঠিয়েছিল।

—উত্তর দিয়েছিলে?

—উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা, আমি দু'এক লাইন পড়েই চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলি।

—কেন?।

—বাবা, মেসো আর মাসতুতো ভাইকে দেখেই পুরুষ জাতের উপরেই আমার ঘেন্না ধরেছিল। তোমার দাদাকে বিয়ের পরই আমি প্রথম বুঝলাম, সব পুরুষমানুষই খারাপ না ; তারাও ভদ্র সভ্য সহানুভূতিশীল হয়।

রাঙাবৌদি একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, আমি জানি, সব মেয়েরাই ভাল না ; একটা সুন্দর সুখী সংসার ভাঙ্গতে একজন নতুন বিয়ে হওয়া বউও যথেষ্ট। মেয়েরা হিংসুটে হয়, ঝগড়াটে হয় কিন্তু পুরুষদের মত খুব কম মেয়েই চরিত্রহীন বদমাইস হয়। তাই বোধহয় সব ছেলেমেয়েরাই বাবার চাইতে মাকে অনেক বেশি ভালবাসে।

ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করে, তুমি নিজেও কী বাবার চাইতে মাকে বেশি

ভালবাসো না?

আমি মাথা নেড়ে বলি, হ্যাঁ।

ও জানলা দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বলে, আমি জানি পাপাই, আমার এসব কথা শুনতে তোমার ভাল লাগছে না কিন্তু একটা কথা কি কখনও ভেবে দেখেছ, স্বামীর অত্যাচার অপমান সহ্য করতে না পেরে শত শত মেয়ে আত্মহত্যা করলেও স্ত্রীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ক'জন স্বামী আত্মহত্যা করে?

কথাটা শুনেই আমার মনে হয়, প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতায় বধূ নির্যাতন ও আত্মহত্যার খবর থাকলেও স্ত্রীর অত্যাচারে স্বামীর আত্মহত্যার খবর তো কখনও পড়ি নি।

সকাল-সন্ধেয় পড়াশুনা, কলেজ, সকাল-দুপুর রাঙাদার সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা আর রাঙাবৌদির সঙ্গে গল্পগুজব আলাপ-আলোচনা করেই সারা দিন কেটে যায়। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আজকাল আমিই সব দরজায় তালা দিই। তারপর ঘরে যাবার পথে রাঙাবৌদির ঘরে উঁকি দিতেই দেখি, ও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা দেখছে।

—কী দেখছ?

—দেখছি নিজেকে আর ভাবছি।

—কী ভাবছ?

—ভাবছি, কেন এই পৃথিবীতে এসেছিলাম? কী দরকার ছিল আমার মত তুচ্ছ এক মেয়ের জন্মাবার?

ও আমার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য ভেবে বলে, আরো অনেক কিছু ভাবছিলাম। তোমার-আমার কথাও ভাবছিলাম।

আমি দু'এক পা এগিয়ে ওর ঘরের মাঝখানে যাই। বলি, আমরা কেউই তো নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসি না। এইসব নিয়ে ভেবে কি লাভ?

—লাভ-লোকসান ভেবেই কী মানুষ চিন্তা করে?

—আর তোমার-আমার কথা কি ভাবছিলে?

—সে আর তোমার শুনতে হবে না। এখন শুতে যাও।

ও একটু হেসে বলে, আবার সাধু-সন্ন্যাসীদের মত সাড়ে চারটেতেই উঠতে হবে।

কিছুদিন ধরেই দেখছি, রাঙাবৌদি আর আমার পাশে শুয়ে গল্পগুজব করতে বিশেষ আসে না। এলেও পাঁচ-দশ মিনিট থেকেই আমাকে আলতো করে একটা চুমু খেয়েই বলে, এবার ঘুমোও। আমিও শুতে যাই।

আমি শুয়ে শুয়ে ওর এই পরিবর্তনের কথাই ভাবি। চন্দ্রিমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবার জন্যই কি রাঙাবৌদি আমাকে আর ভালবাসে না? আমি তো চন্দ্রিমার প্রেমে পড়িনি ; ও যে আমার প্রেমে হাবুখাবু খাচ্ছে, তারও কোন ইঙ্গিত দেখি নি। তাছাড়া আমি তো নিজে ওর সঙ্গে ভাব করতেও যাইনি।

কলেজে প্রথম দিন থেকেই চন্দ্রিমাকে দেখছি। অন্তত দশ-বারোজন ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ওকে গল্পগুজব হাসি ঠাট্টা করতে দেখে মনে হয়েছে, ওরা বোধহয় একই স্কুল থেকে পাশ করেছে, কলেজে ক্লাশ শুরু হবার আট-দশদিন পর যে দু'-চারটি ছেলেমেয়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছে, আমি কোথা থেকে এসেছি, তাদের মধ্যে চন্দ্রিমাও ছিল না। সাত-আট মাস পর একদিন অবিনাশবাবুর বাড়িতে ওকে ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেই আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, তুমি এখানে? তুমিও কী স্যারের কাছে...

ঠিক সেই সময় অবিনাশবাবু বাইরের ঘরে পা দিয়েই একটু হেসে বলেন, ও তো আমার ছোট মেয়ে।

আমি মুহূর্তের জন্য চন্দ্রিমাকে দেখেই বলি, স্যার, আমি জানতাম না।

—এখন তো জানলে।

উনি চেয়ারে বসতে বসতেই বলেন, আমার নোটস্-এর খাতা ওর কাছেই আছে। মাঝে মাঝে দেখে নিও।

—হ্যাঁ, স্যার, নেব।

চন্দ্রিমা একটু হেসে বলে, জানো বাবা, ও খুব লাজুক। ও আজ পর্যন্ত আমাদের কারুর সঙ্গে আলাপও করেনি।

অবিনাশবাবু বলেন, বেশি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না হওয়াই ভাল। ওতে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়।

সেই সেদিন থেকে চন্দ্রিমার সঙ্গে আমার ভাব। আগের মত এখনও মাঝে মাঝেই অবিনাশবাবুর বাড়ি যাই। চন্দ্রিমার সঙ্গেও দেখাশুনা কথাবার্তা হয়। কখনও কখনও ওর পড়ার ঘরে বসে নোটস্ টুকে নিই। ওর হাত দিয়েই মাসীমা চা-টা পাঠান। আমি বাড়িতে এসেই রাঙাবৌদিকে ওর কথা বলি।

আমার কাছে চন্দ্রিমার কথা শোনার ক'দিন পরই রাঙাবৌদি বলল, পাপাই, একদিন চন্দ্রিমাকে আসতে বলো।

—হ্যাঁ, বলব।

চন্দ্রিমাকে রাঙাবৌদির কথা বলতেই ও বলল, হ্যাঁ, যাব বৈকি। ওকে প্রথম দিন দেখেই বেশ লেগেছিল।

—তুমি ওকে কোথায় দেখলে?

—নববর্ষের দিন তোমার দাদার দোকানেই দেখেছি।

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, তোমার রাঙাবৌদিকে দেখতে দারুণ।

আমি একটু হেসে বলি, হ্যাঁ, রাঙ্গাবৌদি বেশ সুন্দরী। তাছাড়া ভারী সুন্দর কথাবার্তা বলেন।

চন্দ্রিমা বলে, শুক্রবার তো সওয়া বারোটাতেই আমাদের ক্লাশ শেষ। তুমি ওকে বলো, সেদিন ক্লাশ শেষের পর তোমার সঙ্গেই যাব।

সে কথা শুনে রাঙাবৌদি আমাকে বলল, যখন দুপুরেই আসবে, তখন ও যেন আমাদের সঙ্গেই খায়।

সেই শুরু। এখন চন্দ্রিমা মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়ি আসে। হৃদ্যতাও বেড়েছে আমার আর রাঙাবৌদির সঙ্গে।

রাঙাবৌদিই তো সেদিন কথায় কথায় বলে, চন্দ্রিমা, তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে?

—না, রাঙাবৌদি, আমার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই। আমার সব বন্ধুত্বের শুরু আর শেষ স্কুল-কলেজেই।

—তার মানে? তুমি কী কোন বন্ধুর বাড়ি যাও না? নাকি তারাও আসে না?

—না, আমি কারুর বাড়ি যাই না।

—কোন মেয়ের বাড়িতেও যাও না?

—না।

—আশ্চর্য!

চন্দ্রিমা একটু শুকনো হাসি হেসে বলে, না রাঙাবৌদি, আশ্চর্যের কিছু না। সত্যি কথা বলতে কি আমি বন্ধুত্ব করতে ভয় পাই।

—ভয় পাও?

—হ্যাঁ, রাঙাবৌদি ভয় পাই।

ও একটু থেমে বলে, তুমি তো ভাল করেই জানো, বাঙ্গালী ছেলেরা আর কিছু না পারলেও মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়তে ওস্তাদ।

ওর কথা শুনে আমরা দু'জনেই হাসি।

আমাদের হাসি দেখেও দেখে না চন্দ্রিমা। ও বলে যায়, আমার দিদির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল এখানকার এস-ডি-ও'র মেয়ে ; যাকে বলে, অভিন্ন হৃদয় তাই আর কি! তারপর একদিন দিদির সঙ্গে পরিচয় হলো বন্ধুর মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে। খুব নামকরা উকিলের ছেলে, বেশ ধনী, কলকাতায় নিজেদের বাড়ি-গাড়ি ছাড়াও বাঁকুড়াতেও

যথেষ্ট জমিজমা আছে।

আমরা চুপ করে শুনি।

—ভদ্রলোককে দেখতেও দারুণ হ্যান্ডসাম।...

রাঙাবৌদি জিজ্ঞেস করে, উনি কী চাকরি...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চন্দ্রিমা বলে, দিদির সঙ্গে যখন ওর আলাপ হয়, তখন উনি যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিলেন।

ও না থেমেই বলে, দিদির সঙ্গে আলাপ হবার পরই ওর এখানে আসা-যাওয়া খুব বেড়ে গেল। দিদিও ওর প্রেমে ভেসে গেল। বাবা-মা বেশ হাসি মুখেই ওর সঙ্গে দিদির বিয়ে দিলেন।

চন্দ্রিমা একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, ও হতচ্ছাড়া বছর খানেক দিদিকে এনজয় করার পরই নিজমূর্তি ধরল। ইতিমধ্যে ঐ উকিলবাবু মারা যাওয়ায় টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি সবই এলো ওর হাতে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে উনি দিন রাত্তির মদ খাওয়া শুরু করলেন।

শুনেই আমাদের রাগ হয়।

—বছর তিনেকের মধ্যেই শ্রীমান বাপের টাকাকড়ি উড়িয়ে দেবার পর শুরু করলেন জমিজমা বিক্রি। সেই সঙ্গে শুরু হলো দিদির উপর অকথ্য অত্যাচার।

হঠাৎ ও গলা চড়িয়ে বলে, তুমি ভাবতে পারো রাঙাবৌদি, ঐ ছোটলোকটা আমাদেরই বাড়িতে বসে দিদিকে দিয়ে দেশী মদ কিনিয়ে এনে দিদিকেই উলঙ্গ করে মারতো?

রাঙাবৌদি চিৎকার করে বলে, কী বলছ তুমি?

—রাঙাবৌদি, সত্যি কথাই বলছি। কিচ্ছু বাড়িয়ে বলছি না।

আমি বলি, চন্দ্রিমা, তোমার দিদি এখনও কি ঐ স্বামীর ঘর করছেন?

—না। ডিভোর্স হবার পর দিদি সারদা মিশনের স্কুলে টিচারের চাকরি করছে আর ওদের হস্টেলেই থাকে।

আরো কিছুক্ষণ ওর দিদিকে নিয়ে আলাপ-আলোচনার পর চন্দ্রিমা একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, রাঙাবৌদি, তুমি স্থির জেনে রেখো, আমি প্রেমেও পড়ব না, বিয়েও করব না। মা-বাবাও বলেছেন, আমার বিয়ে দেবেন না।

—একলা একলা সারাজীবন কাটাতে পারবে?

—আমি তোমাকে সোজাসুজি বলছি, খুব নিঃসঙ্গ বোধ করলে হয়তো দু'একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করব, দেহের দাবি চেপে রাখতে না পারলে কদাচিৎ কখনও ওদের সঙ্গে আনন্দ করতেও পারি কিন্তু বিয়ে করে দাসীবৃত্তি কখনই করব না। ও

আমার দ্বারা হবে না।

চন্দ্রিমা একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, তুমি বিশ্বাস করো রাঙাবৌদি, আমি কখনই দিদির মতো মুখ বুঁজে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতাম না। আমি ওকে খুন করে হাসি মুখে সারাজীবন জেল খাটতাম।

রাঙাবৌদি ওর দুটো হাত ধরে বলে, সব মেয়েরা যদি তোমার মতো হতো, তাহলে সমাজের চেহারাই বদলে যেত।

সেইদিন রাত্রেই রাঙাবৌদি হঠাৎ আমার পাশে শুয়ে পড়ে। আমি মনে মনে খুশি হলেও অবাক না হয়ে পারি না। মুখে কিছু বলি না।

দু'-পাঁচ মিনিট পর রাঙাবৌদি বলে, আমি এতদিন পর তোমার কাছে শুতে এলাম কিন্তু তুমি তো কিছু বলছ না।

—কী বলব?

—শুতে এলাম কেন, তা জানতে ইচ্ছে করছে না?

—নিশ্চয়ই শুতে ইচ্ছা করছিল ; তাই...

রাঙাবৌদি পাশ ফিরে শুলেও আমি চিত হয়েই শুয়েছিলাম। ও মুখের উপর হাত রেখে বলে, এ পাশ ফিরে শোও।

আমি পাশ ফিরে শোবার পর ও আমার মুখের উপর একটা হাত রেখে বলে, তোমার কাছে মাঝে মাঝেই চন্দ্রিমার কথা শুনে আমার রাগ বা হিংসা না হলেও ভাল লাগতো না। তাইতো কয়েক মাস তোমার কাছে বিশেষ আসি নি।

—আজ এলে কেন?

ও একটু হেসে বলে, চন্দ্রিমার একটা কথা শুনে ভাল লাগলো বলেই আজ তোমার কাছে শুতে এলাম।

—কোন কথা?

—ও যখন বলল, ওর ঘর উপরে আর ওর বাবা-মা রাত্রে শুতে আসার সময় ছাড়া কখনই উপরে আসেন না। তাইতো পাপাই স্বচ্ছন্দে আমাকে প্রেম নিবেদন করতে পারতো কিন্তু ও কোনদিন আমার হাতও চেপে ধরে নি, প্রেম নিবেদনও করে নি বলেই...

আমি না হেসে পারি না।

—সত্যি বলছি, ওর কথা শুনে খুব ভাল লাগলো। তাছাড়া...

—তাছাড়া কি?

—দেখলাম, চন্দ্রিমাও কোন হ্যান্ডসাম ছেলে দেখেই গলে যাবার পাত্রী না।

হঠাৎ রাঙাবৌদি উপুড় হয়ে শুয়ে আমার বুকের উপর মুখখানা রেখে বলে, এবার থেকে রোজ তোমাকে একটু আদর না করে কখনই ঘুমুতে যাব না।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, পাপাই, সত্যি কথাই বলছি। ভুলে যেও না, আমি নিছকই একটা সাধারণ মেয়ে, আমি মা সারদাও না, মা আনন্দময়ীও না।

একটু চুপ করে থেকেই আমি জিজ্ঞেস করি, একটা সত্যি কথা বলবে?

—নিশ্চয়ই বলব।

—আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে মনে হয় না, তুমি অন্যায় করছো? নিজেকে অপরাধী বা খারাপ মনে হয় না?

আমার প্রশ্ন শুনেই ও উঠে বসে। বলে, দেখো পাপাই, তোমাকে আমি বহুবার বলেছি, আমি সন্ন্যাসিনী না। আমি বিবাহিতা, আমি সংসারী। সব বিবাহিতা সংসারী মেয়েদেরই অনেক কিছু দিতে হয়, করতে হয় কিন্তু তারাও কিছু প্রত্যাশা করে।

—সে তো থাকবেই।

—শুধু খেতে-পরতে দিলেই স্বামীর কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। স্ত্রীকে সম্মান দিতে জানতে হয়, ভালবাসতে হয় ; স্ত্রীর দেহের দাবিও তাকেই মেটাতে হয়।

রাঙাবৌদি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, আমি কি অন্যায় কিছু বললাম?

—তুমি যা বললে তা তো সব সংসারী মানুষেরই ধর্ম। এর মধ্যে অন্যায় কেন থাকবে?

—আমি তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছি বলে কখনই মনে করি না, আমি কোন অপরাধ করছি। আমার প্রতি কর্তব্য না করে অপরাধ করছে তোমাদের দেবতুল্য দাদা। আমি কী জন্মেছি, নিজের অধিকার বিসর্জন দিতে?

এই কথা ক'টি বলেই ও আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদে।

দু' পাঁচ মিনিট আমি ওকে কাছে টেনে নিই।

ও আমার বুকের পর মুখ রেখে কাঁদতে কাঁদতেই বলে, পাপাই, তুমি বিশ্বাস করো, আমি আর দুঃখ চেপে রাখতে পারি না বলেই মাঝে মাঝে জ্বলে উঠি। তখন আর ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ বিচার করতে মন চায় না।

সে এক অবিস্মরণীয় রাত্রি। কোথা দিয়ে প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল, তা বুঝতেই পারলাম না। দুটি প্রাণের অনির্বাণ কাহিনীর সাক্ষী হয়ে রইল শুধু শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ।

## এগার

অন্যান্য দিনের চাইতে একটু দেরিতে ঘুম ভাঙ্গল। চোখ মেলে দেখি, রাত্রি শেষের বিলীয়মান অন্ধকার সূর্যদেবের আসন্ন আগমন-বার্তা পেয়েই লুকিয়ে পড়েছে। রাঙাবৌদির দিকে তাকাতেই চমকে উঠি। অবিন্যস্ত বেশভূষা। একটা হাত দিয়ে মায়াডোরে আমাকে বন্দী করে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নাকি বিভোর হয়ে স্বপ্ন দেখছে? রাত্রির নেশা কী এখনও কাটেনি?

কয়েক মুহূর্তের জন্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওকে দেখে আমি যেন আনন্দযজ্ঞের মানস সরোবরে ডুব দিই ; কিন্তু হ্যাঁ, ঐ কয়েক মুহূর্তই। পরমুহূর্তেই নিজেকে ধিক্কার দিই। কী হচ্ছে পাপাই? এই স্বামী-সুখভোগ বঞ্চিতাকে খুশি করার জন্য কী তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে? মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেবে?

আমি কোনমতে নিজেকে মুক্ত করে উঠে পড়ি।

রাত্রির একটা বিচিত্র মাদকতা আছে। মহাশক্তিমান দিনমনির উপস্থিতিতে মানুষ মেতে ওঠে কর্মযজ্ঞে ; প্রকাশ করতে পারে না তার দৈন্য দুর্বলতা। রবির তেজে পৃথিবী পর্যন্ত তটস্থ ; রাগে দুঃখে অগ্নিগর্ভ হয়েও বিদ্রোহ করতে পারে না। পৃথিবীর অর্ধেক শাসন করে দিবাকর পৃথিবীর বাকি অর্ধেককে জাগিয়ে তুলতে যেতে না যেতেই মানুষের স্বপ্ন দেখা শুরু হয় গোধূলিবেলায়। ধরিত্রীও অন্ধকারের ওড়নার আড়ালে মেতে ওঠে আপনসৃষ্টির আনন্দলীলায়। মানুষের মন-প্রাণও মদীর হয়ে ওঠে। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরেই তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ওঠে জয়জয়ন্তী। রাত আরো গভীর হয়। সদ্য যুবতী অষ্টাদশীর মত রাত্রি হাত ছানি দেয় মানুষকে। তখন সে মিয়া মল্লার বা দরবারী কানাড়ার সুরে-রসে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ; শুরু হয় পুরুষ-প্রকৃতির লীলা। কিন্তু রাতের নিশির যেমন প্রথম সূর্যের আলোতেই হারিয়ে যায়, মানুষকেও বিসর্জন দিতে হয় মায়াবিনী রাত্রির মাদকতা।

তাইতো ভোরের আলো ঘরের মধ্যে উঁকি দিতেই আমি রাত্রির আনন্দময় অমরাবতী থেকে নেমে আসি মাটির পৃথিবীতে। রাতের রাঙাবৌদিও হারিয়ে যায় দায়িত্ব-কর্তব্যের স্রোতে।

কলেজ থেকে ফিরে এসে খেয়ে দেয়েই শুয়ে পড়ি। ঘুম আসতেও দেরি হয় না। ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখি—কে যেন আদর করছে, কানে কানে ফিস ফিস করে ভালবাসার কথা বলছে। আমার মন ডুব দেয় আনন্দ-সাগরে। আমি একটু হাসি।

পাশ ফিরে শুই। স্বপ্নের প্রেয়সীকে আলতো করে কাছে টানতে গিয়েই কি যেন ভাঙ্গাচোরার আওয়াজ হতেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখি ঘর অন্ধকার। বারান্দার আলো দরজার কাছে ঠিকরে পড়ছে।

রাঙাবৌদি ঘরে ঢুকেই আলো জ্বেলে একটু হেসে বলে, তুমি নিশ্চয়ই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

মেঝে থেকে ভাঙ্গা কাপ-ডিশের টুকরো তুলতে তুলতে ও বলে, চা দিয়ে তোমাকে ডেকে দিলাম। তুমি বললে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। জেগে জেগে কী স্বপ্ন দেখছিলে?

বলতে পারলাম না, হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখছিলাম। মুখে বললাম, কাপ-ডিশটা ভাঙ্গলাম তো!

—মাঝে মাঝে কিছু ভাঙ্গাচোরা না হলে নতুন আসবে কোথা থেকে।

ভাঙ্গা কাপ-ডিশের টুকরোগুলো হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, আমি এখুনি তোমার চা করে আনছি।

আগে খেয়াল করিনি কিন্তু রাঙাবৌদি চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই খেয়াল করলাম, ওর গা-টা ধুয়ে সাজগোছ করা হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর মনমোহিনী রূপ দেখে মুগ্ধ হলেও মুখে কিছু বলি না। কিন্তু চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে ওর দিকে তাকিয়েই বলে ফেলি, দিদি তোমার সকাল-সন্ধের রূপ দেখে কোনদিন গেয়ে ওঠেনি—'আমি সন্ধ্যাবেলার চামেলী গো, সকাল বেলার মল্লিকা'?

ও আমার গালে আলতো করে একটা চড় দিয়ে বলে, চা খেয়ে পড়তে বসো। আমি চামেলী কি মল্লিকা, তা নিয়ে তোমাকে এখন ভাবতে হবে না। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।

আমি পড়তে বসতে না বসতেই কলিং বেল বাজে। আমি ঘর থেকে বারান্দায় পা দিতেই রাঙাবৌদি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, পাপাই, দরজাটা খোলো তো!

আমি দরজার দিকে এগুতেই ও আপনমনে বলে, মালতী নাকি?

দরজা খুলে দেখি, বিশুদা এসেছেন। উনি বৌদির হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ দিয়েই বলেন, একটু আগেই খবর এলো, খুকী আসছে ভাগীরথী এক্সপ্রেসে ; আবার কাল সকালেই ফিরে যাবে।

শুনে আমরা দু'জনেই একটু চিন্তিত হই। আমি কিছু না বললেও রাঙাবৌদি জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ খুকী আসছে? কোন বিপদ-আপদ ঘটল নাকি?

—না, না, সেসব কিছু না।

বিশুদা একটু হেসে বলে, বোধহয় কোন বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে আসছে।

ওর কথা শুনে আমরা দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হই।

—খুকী আসছে বলে দাদা মাংস পাঠিয়ে দিলেন। আর বলেছেন, খুকীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে একেবারে খেয়ে-দেয়ে দোকানে আসবেন।

বিশুদা আর দাঁড়ায় না ; সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়।

আমি দরজা বন্ধ করতেই রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, আমার মনে হচ্ছে, খুব শিঘগিরই বুবুনদার সঙ্গে খুকীর বিয়ে হবে। তাই ও তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলতে আসছে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

সারা মুখে এক গাল হাসি নিয়ে দিদিকে ঢুকতে দেখেই আমি আর রাঙাবৌদি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে যেন মনে মনে বলি, যা বলেছিলাম, ঠিক তাই।

দিদি বাড়ির মধ্যে পা দিয়েই বলে, রাঙাবৌদি, চট করে চা করে আনো। অনেক কথা আছে।

—আগে বলো, কবে দিন ঠিক হলো।

রাঙাবৌদি হাসতে হাসতেই বলে।

—আগে চা দাও ; তারপর সব বলছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাঙাবৌদি ট্রেতে চার কাপ চা নিয়ে রাঙাদার ঘরে ঢোকে। ট্রে থেকে চায়ের কাপ তুলে নিয়েই দিদি খুশির হাসি হেসে বলে, একটা খুব ভাল ছেলের সঙ্গে মিতুর বিয়ের কথা...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই রাঙাবৌদি বলে, আমি তো ভেবেছিলাম, বুবুনদার সঙ্গে তোমার বিয়ের দিন...

—আগে যা বলছি, তাই শোনো।

দিদি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রাঙাদার দিকে তাকিয়ে বলে, শুভদীপ ব্যানার্জী বলে একটি ছেলে মিতুদের ওখানেই সফ্‌টওয়্যার এঞ্জিনিয়ার। ও আই-আই-টি থেকে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পাশ করেছে। বাবা নেই ; শুভদীপের তিন বছর বয়সের সময়ই উনি অ্যাকসিডেন্টে মারা যান।

রাঙাদা বলে, ছেলেটি নিশ্চয়ই ব্রিলিয়ান্ট।

—হ্যাঁ, রাঙাদা, ও সত্যি ব্রিলিয়ান্ট।

দিদি আবার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শুরু করে, ছেলেটির আর কোন ভাইবোন নেই ; মা বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা। বাইপাসের ধারে একটা ফ্ল্যাট বুক করেছেন;

বোধহয় বছর খানেকের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।...

রাঙাবৌদি জিজ্ঞেস করে, ওকে কী মিতুই পছন্দ করল?

—দু'জনেরই দু'জনকে ভাল লেগেছে।

ও একটু থেমে বলে, শুভদীপকে সবারই ভাল লাগবে।...

রাঙাদা বলে, তুই ওকে দেখেছিস?

দিদি এক গাল হেসে বলে, দেখেছি মানে? ও তো এখন দিদি বলতে অজ্ঞান।

আমাদের তিনজনের মুখেই হাসি।

—জানো রাঙাদা, শুভদীপ শুধু লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরিই করছে না, ভারী সুন্দর সহজ-সরল। ওকে দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, ও সত্যি ভাল ছেলে।

রাঙাবৌদি বলে, শুভদীপ আর মিতু'র বিয়ে নিয়ে এত মেতে উঠলে কেন? আগে বুবুনদার সঙ্গে...

—শুভদীপ সামনের মাসেই আমেরিকা যাচ্ছে। ওর মা ওকে সোজা বলে দিয়েছেন, ওখানে গিয়ে একলা থাকা চলবে না। বিয়ে করে বউ নিয়ে যেতে হবে।

এবার রাঙাদা প্রশ্ন করে, শুভদীপের মা কি মিতুকে দেখেছেন?

—শুভদীপরা এখন সল্ট লেকেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। শুভদীপের সঙ্গে মিতু প্রায়ই ওদের বাড়ি যায়। আসলে শুভদীপের মা নিজেই মিতুকে পছন্দ করেছেন।

দিদি না থেমেই একটু হেসে বলে, মিতুকে পছন্দ হবার পর উনিই হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ি এসে হাজির।

এবার আমি বলি, আচ্ছা দিদি, আমাদের মত অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ওনার ছেলের বিয়ে দিতে কী সত্যি মত আছে?

—সে কথা আমরা সবাই ওনাকে বার বার বলেছি। তার উত্তরে উনি বলেছেন, আমি নিজে কেরানীর মেয়ে, আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন স্কুলের মাস্টার ; আমি কি সাধারণ পরিবারের মেয়েকে পুত্রবধূ করতে আপত্তি করতে পারি?

আমি হাসতে হাসতে বলি, দেখছি, ছোড়দি একটার পর একটা লটারী জিতেই চলেছে।

আমার কথায় ওরা সবাই হাসে।

রাঙাদা জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে খুকী, শুভদীপকে মামা-মামী-মাসী দেখেছে?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে হেসে বলে, আজকাল তো শুভদীপ মাঝে মাঝেই নিজের গাড়িতে মিতুকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, ওদের কি গাড়ি আছে?

—হ্যাঁ, একটা মারুতি আছে।

—ছোড়দি জব্বর ছেলে পাকড়াও করেছে।

আবার ওরা আমার কথায় হাসে।

রাঙাদা বলে, সবকিছু ফাইন্যাল হয়েছে?

দিদি বলে, না, না, ফাইন্যাল হয়নি।...

রাঙাবৌদি বলে, কেন?

—বাবা-মা-ছোট পিসী তো দূরের কথা, মিতু পর্যন্ত শুভদীপ আর ওর মাকে বলেছে, রাঙাদা মত দিলে তবেই এ বিয়ে হবে।

শুনে রাঙাদা হাসে।

—বাবা বলেছেন, রাঙা বুবুনের সঙ্গে পরামর্শ করে যা ঠিক করবে, তাতেই আমাদের মত আছে।

দিদি রাঙাবৌদির দিকে তাকিয়ে বলে, শুভদীপ কাল আমাকে কী বলেছে জানো?

—কী বলেছে?

—বলেছে, দিদি, আমাকে আর বুবুনদাকে সঙ্গে নিয়ে রাণাঘাটে চলুন। আমি ওখানে গিয়েই রাঙাদার কাছে ইন্টারভিউ দেব আর রাঙাবৌদির আদর-যত্নও এনজয় করবো।

—শুভদীপ তো বেশ রসিক আছে।

—হ্যাঁ, ও খুব মজার মজার কথা বলে।

রাত্রে খেতে বসে দিদি রাঙাদাকে বলে, তোমাকে পরশু দুপুরের মধ্যেই কলকাতা আসতে হবে। বিকেলে তুমি আর বুবুনদা ওদের বাড়ি যাবে। যদি তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে তার পরদিনই তুমি ওকে আশীর্বাদ করবে।

রাঙাদা বলে, মামা থাকতে আমি কেন আশীর্বাদ করবো?

—বাবা শুভদীপের মাকে বলেছেন, রাঙা আমার ভাগনে হলেও তাকেই আমরা বড় ছেলে মনে করি। পছন্দ করা, আশীর্বাদ করা, সম্প্রদান করা—সবই সে করবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাঙাদা দিদিকে জিজ্ঞেস করে, শুভদীপ কী খুব শিগ্গিরই আমেরিকা যাবে?

—হ্যাঁ, সামনের মাসের সাতাশে ওকে রওনা হতেই হবে।

—তার আগেই শুভদীপের মা ছেলের বিয়ে দিতে চান?

—হ্যাঁ।

দিদি একটু থেমে বলে, সামনের বারোই অথবা আঠারই উনি ছেলের বিয়ে দিতে চান।

—এর মধ্যে কি সব বিধিব্যবস্থা করা সম্ভব?

—শুভদীপ আর ওর মা বার বার আমাদের বলেছেন, মিতুকে এটা সরু হার আর আংটি ছাড়া শুধু দু'চারটে সিল্কের শাড়ি দিতে। শুভদীপ একটা আংটি ছাড়া আর কিছু নেবে না।

—কিন্তু তাই কি হয়?

—শুভদীপের মা পই পই করে বলেছেন, আমার ছেলে সোনার গহনা ব্যবহার করা একদম পছন্দ করে না। আমার যা সামান্য গহনা ছিল, সেসব বিক্রি করেছি ছেলেকে পড়াবার জন্য।

দিদি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, তাছাড়া উনি বলেছেন, বিয়ের পর পরই যখন ওদের বিদেশে চলে যেতে হবে, তখন শুধু শুধু জিনিষপত্র দিয়ে হবে কী?

—তা ঠিক কিন্তু...

—না, রাঙাদা, সত্যি ওরা কিছু নেবে না।

আমি দিদির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, ছোড়দিকে কবে আমেরিকা যেতে হবে?

—মিতুকে সঙ্গে নিয়েই শুভদীপ যাবে।

—ও মাই গড।

—মিতুর পাশপোর্ট হয়ে গেছে, প্লেনে সীট বুক করা হয়ে গেছে ; বিয়ের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট জমা দেবার দু'দিন পরই ভিসা পাবে।

—এইসব হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

দিদি পরদিন সকালেই ভাগীরথী এক্সপ্রেসে চলে যায় ; রাঙাদা ঐ ট্রেনেই যায় তার পরদিন।

কলকাতায় চারদিন কাটিয়ে রাঙাদা ফিরে এসে আমাদের বলে, শুভদীপকে দেখে আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেছে। আমার ধারণাই ছিল না, আজকালকার দিনে এই ধরনের ছেলেও আছে।

রাঙাবৌদি বলে, আর ওর মা?

—উনি নিছকই মধ্যবিত্ত বাড়ির বউ আর মা। যারা জানে না তারা ওকে দেখে ভাবতেই পারবে না, উনি বেথুন কলেজের মত বিখ্যাত কলেজের প্রফেসার।

—বুবুনদা কি বলে?

রাঙাদা হাসতে হাসতে বলে, বুবুন বলে, শুভদীপের মত ছেলে হয় না আর শুভদীপ বলে, বুবুনদার মত মানুষ দুর্লভ।

—বিয়ের আগে আমি শুভদীপকে দেখব না?

—নিশ্চয়ই দেখবে।

—কী করে দেখব?

—ধৈর্য ধরো ; ঠিক দেখতে পাবে।

শনিবার ভোরে না এসে একটু বেলা করেই রাঙাদা বাড়ি এলো দুটো ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে। রাঙাবৌদি জিজ্ঞেস করে, এত বাজার করলে কেন?

—আমার দু'জন বিজনেস ফ্রেন্ড কলকাতার মেটিয়াবুরুজ থেকে আসবেন। ওরা বোধহয় আজ এখানেই থাকবেন, তাই...

—তাই বলো!

আমি কলেজে যাবার জন্য যথাসময়ে চান করি, জামাপ্যান্ট পরি, বইপত্তর গোছাই কিন্তু দোকানে যাবার জন্য রাঙাদার কোন উদ্যোগ দেখি না। আমি আমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলি, রাঙাবৌদি, খেতে আসব?

রাঙাবৌদি না, রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে রাঙাদা বলে, পাপাই, তুই আর আজ কলেজ যাস না। আমার একটু কাজ আছে।

ওর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই পর পর দু'তিনবার কলিং বেল বাজে। আমি বারান্দা পেরিয়ে দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই রাঙাদা প্রায় ছুটে এসে দরজা খোলে। সঙ্গে সঙ্গে দিদির চিৎকার শুনি, রাঙাবৌদি, শিগ্‌গির এসো।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই, রাঙাবৌদিও লাফাতে লাফাতে হাজির।

দিদি বুবুনদা আর একজনকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে রাঙাবৌদিকে বলে, দু'জন আসামীকে নিয়ে এলাম।

রাঙাবৌদিও এক গাল হেসে অপরিচিত ভদ্রলোকের একটা হাত ধরে বলে এসো, শুভ, এসো।

বুবুনদা এবার রাঙাদা আর রাঙাবৌদিকে প্রণাম করতে করতেই বলে, ও শুভ না, ও আমার সহকর্মী। ওকে হাত ধরে টেনে নিলে আর আমি কী চলে যাব?

শুভদীপও ওদের দু'জনকে প্রণাম করে। তারপর বলে, সাপুড়েরা যেমন সাপকে বশ করে, রাঙাদাও ঠিক ঐরকম আমাকে বশ করেছে। তাই তো না জানিয়েই চলে এলাম আপনাকে বিরক্ত করতে।

বারান্দা দিয়ে ঘরের দিকে এগুতে এগুতেই রাঙাবৌদি বলে, না জানিয়ে তো

আসো নি কিন্তু তোমাদের দাদাও যে চক্রান্তের শরিক হবেন, তা তো ভাবতে পারি নি।

যাইহোক আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

ঘরে ঢুকেই রাঙাবৌদি বলে, খুকী, তুমি চা করে আনো তো। আমি এই দুটো আসামীর সঙ্গে একটু কথা বলি।

চা খেতে খেতে সবার মুখে যেন খৈ ফোটে। সেই সঙ্গে হাসি। রাঙাদা পর্যন্ত আজ আমাদের সঙ্গে সমান তালে কথা বলেন, হাসেন।

রাঙাবৌদি রান্নাঘরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই শুভদীপদা বলে, চললেন কোথায়?

—রান্নাবান্না করব না? শুধু আড্ডা দিলেই পেট ভরবে?

—রান্নার জন্য চিন্তা করছেন কেন? আমি তো আছি!

—থাক্! আর ওস্তাদী করতে হবে না।

দিদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, ও রাঙাবৌদি! শুভ সত্যি ভাল রান্না করে।

রাঙাদা বলে, হ্যাঁ, খুকী ঠিকই বলেছে। আমি শুভদের বাড়িতে গিয়ে ওর হাতের মাংস আর চাটনী খেয়ে অবাক হয়ে গেছি।

রাঙাবৌদি বলে, দেখছ খুকী, তোমাদের দাদা এসব খবর আমাকে জানান নি।

হঠাৎ শুভদীপদা উঠে দাঁড়িয়ে রাঙাবৌদিকে বলে, এরা বক বক করুক। চলুন তো আমি আর আপনি রান্নাঘরে যাই।

দিদি বলে, আমি কী আসব তোমাদের হেল্‌প করতে?

শুভদীপদা বলে, নট অ্যাট অল!

ওরা চলে যেতেই দিদি বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন নিয়ে রাঙাদার সঙ্গে কথা বলে। বুবুনদা জানায় নিমন্ত্রিত আর বরযাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার বিধিব্যবস্থার কথা। ঐসব কথা চলতে চলতেই রাঙাবৌদি ট্রে-তে দু' কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকে ; পিছন পিছন দু'হাতে দু'প্লেট পাকৌড়া নিয়ে আসে শুভদীপদা।

ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতেই রাঙাবৌদি দিদিকে বলে, শুভ'র রান্না করা দেখে সত্যি আমি অবাক হয়েছি। দু'রকম মাছের ঝোলই ও করেছে।

—পাকৌড়া করলে কেন?

রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, শুভ কী আমার পারমিশন নেবার পরোয়া করে?

আমি বলি, ছোড়দি ভালই থাকবে।

শুভদীপদা বলে, পাপাই, তোমার ছোড়দিকে ভাল না রাখলে এই দাদা-বৌদি আর দিদি-বুবুনদা আমাকে আস্ত রাখবে?

চা-পাকৌড়া খেতে খেতেই রাঙাবৌদি বলে, তোমরা মিতুকে আনলে না কেন? ও একলা একলা কলকাতায় পড়ে আছে আর আমরা আনন্দ করছি।

শুভদীপদা বলে, রাঙাবৌদি, বিয়ের আগে মিতুকে নিয়ে ঘোরাঘুরি মা পছন্দ করেন না।

—যেমন তোমরা কলকাতায় ঘোরাঘুরি করতে, সেইরকমই...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই শুভদীপদা বলে, না, কলকাতাতেও ওকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করিনি। আমাদের বাড়িতে বসেই ওর সঙ্গে গল্পগুজব করেছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, রাঙাবৌদি।

ও না থেমেই বলে, মা বলেন, বিয়ের আগে ঘোরাঘুরি করলে বিবাহিত জীবনের চার্ম যেমন কমে যায়, সেইরকম ছেলেমেয়ে দু'জনেরই মর্যাদা থাকে না।

—হ্যাঁ, তা ঠিক।

দুঃখের দিনে প্রতিটি মুহূর্তকে যেন এক একটা ঘণ্টা মনে হয় কিন্তু আনন্দের সময় যেন ঝড়ের বেগে উড়ে যায়।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় বুবুনদা রাঙাবৌদিকে বলে, আমরা সকালের ভাগীরথী এক্সপ্রেসেই কলকাতা ফিরব।

—কে তোমাদের সকালে যেতে দিচ্ছে? তোমরা খেয়ে-দেয়ে বিকেলের দিকে যাবে। তার আগে এক পা নড়তে পারবে না।

দিদি বুবুনদা-শুভদীপদার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি তোমাদের কী বলেছিলাম?

যাইহোক গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টা করতে করতেই হঠাৎ এসে গেল ওদের চলে যাবার সময়। শুভদীপদা দু'হাত দিয়ে রাঙাদা-রাঙাবৌদির দুটো হাত ধরে বলে, কোন ভাইবোন নেই বলে প্রাণভরে কোনদিন আনন্দ করার সুযোগই হয় নি। এখন আর আমার সে দুঃখ থাকবে না। এই তিরিশ-বত্রিশ ঘণ্টার কথা আমি জীবনেও ভুলব না।

রাঙাবৌদি বলে, তোমরা যে কি আনন্দ দিয়ে গেলে, তা কল্পনাও করতে পারবে না।

ওদের রাণাঘাট লোকালে চড়িয়ে রাঙাদা গেল দোকানে, আমি ফিরে এলাম বাড়ি।

রাঙাবৌদি দরজা খুলে দিয়েই ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। আমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, কী হলো? শরীর খারাপ লাগছে?

মুখে কিছু না বলে ও মাথা নেড়ে জানালো, না।

—তবে শুয়ে পড়লে কেন? তুমি তো কোনদিন এই সময় শোও না।

—এমনি।

আমি চুপ করে দু' চার মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার ঘরে আসি। একটু শুই, একটু বসি, আবার কিছুক্ষণ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ঐ অন্ধকার দিঘির দিকে তাকিয়ে থাকি। তারপর পড়তে বসি কিন্তু মন বসে না। তবু একটা বই খুলে বসে থাকি।

রাঙাবৌদি ধীর পায় আমার ঘরে ঢুকে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে, পাপাই, কী খাবে?

—কিছু না।

—কেন?

—খিদে নেই। দুপুরে বড্ড বেশি খাওয়া হয়েছে।

—সত্যি খাবে না?

—না, সত্যি খাবো না।

—কফি খাবে তো?

—তুমি খেলে খেতে পারি।

কফি খেতে খেতেই রাঙাবৌদি বলে, আজ তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ব কেমন?

—কাল রাত্তিরে তো বিশেষ ঘুম হয়নি। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়াই ভাল।

—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি।

হরিপদদা রাঙাদার খাবার নিয়ে যাবার পরই আমরা খেতে বসি। দশটা বাজতে না বাজতেই আমি ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। শুভদীপদার কথা ভাবি। এত গুণী ছেলে, এত টাকা মাইনে পায়, ক'দিন পরই সস্ত্রীক আমেরিকা যাবে তিন বছরের জন্য অথচ দেখে বুঝা যায় না। মনে হলো, নেহাতই প্রতিবেশী, বহুকালের চেনা। তবে সব চাইতে অবাক হয়েছি, ও ছোড়দিকে নিয়ে কোনদিন কোথাও বেড়াতে যায়নি। ঠিক বিপরীত দেখি আমাদের কলোনীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে। লেখাপড়া শিখুক বা না শিখুক, দাঁড়ি-গোঁফ গজাতে না গজাতেই ছেলেরা কোন এক বান্ধবীকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কোন গাছতলায় জড়াজড়ি করে কাটিয়ে দেয় সারা দুপুর।

ছোড়দির সৌভাগ্যের কথাও মনে হয়। আগে মনে করতাম ও আমাদের কলোনীরই কোন এক রোমিওকে বিয়ে করে দু'চার মাস স্ফূর্তি করার পর

সারাজীবন চোখের জল ফেলবে। চাকরি পাবার পর ওর আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে অবাক হয়েছি। ওকে যখন শুভদীপদার মত ছেলের ও তার অধ্যাপিকা মা'র ভাল লেগেছে, তখন ওর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করা যাবে না।

আসলে পরিস্থিতি, পরিবেশ আর সুযোগ মানুষকে বদলে দেয়। ছোড়দি তার প্রমাণ।

হঠাৎ মনে হয়, আমি কী ভবিষ্যতে দিদি-ছোড়দির মত হতে পারব?

ঠিক সেই সময় রাঙাবৌদি এসে আমার পাশে শুয়েই বলে, ঘুমোও নি কেন?

—নানা কথা ভাবছিলাম।

—নানা কথা মানে?

—শুভদীপ আর ছোড়দির কথা ভাবছিলাম।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সঙ্গে সঙ্গেই বলি, নিজের কথাও ভাবছিলাম?

—নিজের কথা কি ভাবছিলে?

—ভাবছিলাম, দিদি-ছোড়দির উপযুক্ত ভাই হতে পারব কী?

রাঙাবৌদি আমার মুখের ওপর একটা হাত রেখে বলে, দেখো পাপাই, কখনও দেখবে একটি মানুষের জন্য একটা পরিবার অধঃপাতে যায় ; আবার কখনও কখনও দেখবে, একজনের জন্য একটা পরিবারের অদৃষ্ট আকাশ-পাতাল বদলে যাচ্ছে।

আমি চুপ করে ওর কথা শুনি।

—সাধারণতঃ দেখবে, ছেলেমেয়েরা বাপের মতই ভাল-মন্দ হয়। তোমাদের পরিবারে তা হয়নি, হবেও না।

ও না থেমেই বলে যায়, খুকী অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বুবুনদার প্রভাব। তার ফলে খুকী আদর্শস্থানীয় হয়েছে। মিতু আর তোমার কাছে খুকী আর বুবুনদাই আদর্শ ; তোমাদের বাবা না।

—ঠিক বলেছ।

এবার ও একটু হেসে বলে, আজ আমি বলে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে খুকী-মিতুর মত তুমিও সাকসেস্‌ফুল হবে।

—সত্যি তুমি তাই মনে করো?

—নিশ্চয়ই মনে করি।

আমি আনন্দে খুশিতে ওকে একটা চুম্বন না করে পারি না।

একটু চুপ করে থাকার পর রাঙাবৌদি বলে, তোমরা স্টেশনে রওনা হবার পর বাড়িটা এত ফাঁকা লাগছিল যে টিকতে পারছিলাম না।

—তা তো হবেই।

—ঐ দেড়-দু' ঘণ্টা যে কিভাবে একলা একলা কাটিয়েছি, তা বলতে পারব না।

—বাড়িতে ফিরে তোমাকে দেখেই তা বুঝেছি।

একটু পরেই রাঙাবৌদি বলে, এবার ঘুমোও।

—তুমি কী এখানেই ঘুমোবে?

—হ্যাঁ ; আজ আর একলা শুতে ইচ্ছে করছে না।

দেখতে দেখতে ছোড়দির বিয়ের দিন এগিয়ে আসে। রাঙাদা আরো দু'বার কলকাতা ঘুরে এলেন। আমি আর রাঙাবৌদিও ঘুরে এলাম দু'দিনের জন্য। ওর মধ্যে একদিন দিদি আর রাঙাবৌদি ছোড়দির শাড়িগুলো কিনে আনল। আমি দু'দিনই নেমন্তন্নর কার্ড বিলি করলাম ছোট পিসীকে সঙ্গে নিয়ে। তারপরের দিনগুলো ঝড়ের বেগে উড়ে গেল। ছোড়দির বিয়েতে খুব খাটাখাটনি করলেও খুব আনন্দ করলাম। শুভদীপদাদের বাড়িতে বৌভাতের দিনও খুব আনন্দ করলাম। তবে হাউ মাউ করে কাঁদলাম শুভদীপদা-ছোড়দিকে দমদমে বিদায় জানাতে গিয়ে। আমাকে জড়িয়ে ধরে ছোড়দিও কি কান্নাই কাঁদল।

আবার রাণাঘাটে ; আবার পুরনো জীবন।

## বারো

সময়ের একটা বিচিত্র গতি আছে। পর পর দু'তিনদিন বৃষ্টি হলেই আমরা বিরক্ত হই ; বলি, এ বৃষ্টি কবে যে থামবে, তার ঠিকঠিকানা নেই। বৃষ্টি আপন সময়েই থামে। সারা আকাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এক টুকরো কালো মেঘ দেখা যায় না। শরৎ-হেমন্ত আসে যায়। জাঁকিয়ে শীত পড়ে। ঘরের মধ্যে থাকলেই কাঁপুনি লাগে। রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে বলি, আঃ! কি আরাম! দু'দিন পর এই রোদ্দুরকেই অসহ্য মনে হয়। তখন ঘরের মধ্যে, গাছের ছায়ায় কাটিয়েই আনন্দ পাই।

জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমাদের এই মনোভাব। স্কুলে নীচু ক্লাশে পড়ার সময় কখনও ভাবি, আট-দশ বছর পড়ার পর মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক দিতে হবে? বাপরে বাপ! ছোট্ট সন্তানকে কোলে নিয়ে সব মায়েরাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এ যে কবে একটু হাঁটতে-চলতে শিখবে আর নিজের হাতে খেতে পারবে! দেখতে দেখতে ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক সামান্য কথা, আরো কত পড়াশুনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। মায়ের কোলের ছোট্ট সন্তানও শৈশব কৈশোর স্বচ্ছন্দে পার হয়ে পূর্ণ যৌবনের সিংহদ্বারে পৌঁছে যায়। তখন ম.য়েদের মুখেই শোনা যায়—মনে হয় এইতো সেদিন খুকী-মিতু-পাপাই হলো! আর আজ এরা কত বড় হয়ে গেছে।

আসলে দৈনন্দিন জীবনের চিন্তায় আমরা মগ্ন থাকি বলেই চিরন্তন সত্যকে ভুলে যাই। ভুলে যাই, সুখ বা দুঃখের দিনও একদিন শেষ হয়। একদিন যেসব জজ্-ম্যাজিস্ট্রেট-মন্ত্রী-আমলা-পুলিশ অফিসাররা ক্ষমতার দম্ভে মাটিতে পা ফেলতেও ঘৃণাবোধ করতেন, গদী হারাবার পর তাদের রিক্সা চড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, থলি হাতে বাজারেও যেতে হয়। তখন তাদের কে চেনে? কে পরোয়া করে? তখন এরা উপহাসের পাত্র। দুঃখের দিনের স্মৃতি ক'জন অনন্তকাল মনে রাখেন? মনে রাখেন না বলেই তো বিপত্নীক আর বিধবারাও আবার হাসতে পারেন ; অনেকে আবার হাসি মুখে মালাবদল করে নতুন জীবন শুরু করেন।

আমার রাণাঘাটের দিনগুলোও যেন খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর মতো পার হয়। পার্ট-ওয়ান বেশ ভালভাবেই পাশ করি। অবিনাশবাবু খুব খুশি, খুশি আমাদের বাড়ির সবাই আর রাঙাদা-রাঙাবৌদি। থার্ড ইয়ারে উঠে আরো বেশি পড়াশুনা করি। পূজার ছুটিতে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য কলকাতা যাই। দিদি যথারীতি দু'এক মাস অন্তর আসে। তাছাড়া একবার মাকে, আরেকবার ছোট পিসীকেও সঙ্গে এনেছিল। ছোট পিসীর প্রেসার নিয়ে আর বিশেষ দুঃশ্চিন্তা না থাকলেও বাবা দিন দশেকের জন্য খুবই অসুস্থ হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের ডাঃ দিলীপ

মজুমদারের চিকিৎসায় ভাল হয়ে যান। দিদি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিসট্রেস হয়েছে ; বুবুনদারও প্রমোশন হয়েছে। রাঙাদা আমাদের বাড়ির সবাইকে বলেছেন, পাপাই-এর ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হবার পর পরই খুকী-বুবুনের বিয়ে দিতেই হবে। কিছুতেই আর দেরি করা চলবে না। রাঙাদার কথা শেষ পর্যন্ত দিদিও মেনে নিয়েছে।

ওদিকে ছোড়দিরাও বেশ ভালই আছে। গরমের ছুটিতে শুভদীপদার মা নতুন মাসীমা ওদের কাছে গিয়েছিলেন। ওনার হাত দিয়ে মা আর ছোট পিসী দু'-তিন রকমের বড়ি, আচার আর পোস্ত পাঠিয়েছিলেন। দিদি পাঠিয়েছিলেন দুটো সিল্কের শাড়ি আর বুবুনদা শুভদীপদাকে পাঠিয়েছিলেন মুগার পাঞ্জাবি আর একটা ভাল তাঁতের ধুতি। উনি ছোট্ট একটা চিরকুটে লিখেছিলেন, পূজার সময় পরবে। মাসীমার হাত দিয়ে ওরাও আমাদের সবার জন্য ভাল ভাল উপহার পাঠায়। আমি পেয়েছি দুটো অ্যারো শার্ট, রাঙাবৌদি পেয়েছে খুব ভাল চীনা সিল্কের শাড়ি আর রাঙাদা পেয়েছে খুব দামী শেফার্স কলম। ছোড়দি রাঙাদাকে লিখেছে, রোজ এই কলম দিয়ে দোকানের হিসেব লিখলে তুমি প্রত্যেক দিন মনে করবে, আমি ছোটবেলায় তোমার জামা-কাপড় হরদম নষ্ট করতাম। আর হ্যাঁ, এ কলম কাউকে দেবে না।

রাঙাদা হাসতে হাসতে বলল, মিতু এখনও সেইরকমই পাগলী আছে! ও এখনও বড় হয়নি।

আনন্দে আর গর্বে রাঙাদা ঐ কলম আর চিঠি দুনিয়ার সবাইকে দেখিয়েছে। এমন কি অবিনাশবাবুকে পর্যন্ত দেখাতে ভোলে নি।

অন্য দিকে আমার আর রাঙাবৌদির সম্পর্ক এখন অনেক সহজ সরল ও স্থিতিশীল হয়েছে। এখন পদ্মার উন্মত্ততাও নেই, অপরাধবোধও নেই কারুর মনে।

আজকাল সন্ধের সময় গা ধুয়ে এসে ঘরে ঢুকেই রাঙাবৌদি প্রায়ই আমাকে বলে, আমার পিঠে একটু পাউডার দিয়ে দাও তো।

—শুধু পিঠে?

—আবার কোথায় দেবে?

—সামনে দিতে হবে না?

—একটি থাপ্পড় খাবে।

এরপর আমরা এক সঙ্গে চা-টা খাই। টুকটাক কথা বলি। তারপরই রাঙাবৌদি লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। বলে, পড়তে বোসো। আর এক মিনিটও নষ্ট করো না।

হ্যাঁ, আমি পড়তে বসি। সাড়ে দশটা-এগারটার আগে কখনই উঠি না। মধ্যে একবার রাঙাবৌদি আমার টেবিলের উপর এক কাপ কফি রেখেই চলে যায় ; কোন কথা বলে না। আজকাল খেয়েদেয়ে শুতে শুতে বেশ রাত হয়। শোবার পর আমি বলি, আজকাল আমার জন্য তোমাকেও অনেক দেরি করে খেতে হয়, শুতেও অনেক রাত হয়।

—না, পাপাই, আমার দেরি হয় না। তুমি যখন পড়ো, তখন আমিও তো আমার ঘরে বসে বই-টই পড়ি।

ও একটু থেমে বলে, ভালভাবে পড়াশুনা করে তুমি অনার্স নিয়ে পাশ করলে আমার কি আনন্দ হবে, তা কি ভেবে দেখেছ? আমি নিজের দুঃখ অভাব অপূর্ণতা কিছুটা ঘোচাবার জন্য তোমাকে নিয়ে আনন্দ করি বলেই আমি চাই, তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াও, তুমি দশজনের একজন হও।

—আমাকে তুমি এত ভালবাসো কিন্তু আমাকে তো একদিন চলে যেতে হবে, তখন?

—নিশ্চয়ই যাবে, একশ' বার যাবে। আমি এত হীন নীচ স্বার্থপর নই যে তোমাকে চিরকালের জন্য আটকে রাখব।

—কিন্তু তখন তো তোমার রাগ বা দুঃখ হতে পারে?

—না, তা হবে না। কারণ আমি জানি, তোমার আমার এই সম্পর্ক কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না,-হওয়া উচিতও নয়।

—ভালবাসা না আবেগের ব্যাপারে মানুষ কি উচিত-অনুচিতের কথা ভাবে?

—সবাই পারে না কিন্তু পারা উচিত।

ও একটু হেসে বলে, পাপাই, একটা কথা স্থির জেনে রেখো, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক আমৃত্যু থাকে বা থাকতে পারে কিন্তু লাখে একজন ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে সারাজীবন। সবাই কী খুকী-বুবুনদার মত কপাল নিয়ে জন্মায়?

কিছুক্ষণ আমরা কেউই কোন কথা বলি না। তারপর আমি বলি, আচ্ছা রাঙাবৌদি, তোমাকে ভালবেসে, তোমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে আমি কী অন্যায় করছি না?

—না।

—না কেন?

—সব চাইতে বড় কথা তুমি কারুর অধিকার ছিনিয়ে নাও নি ; তোমার ভালবাসার জন্য কাউকে চোখের জলও ফেলতে হচ্ছে না।

—কিন্তু...

—না, পাপাই, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। তুমি কী আমার স্বামীকে বঞ্চিত করছো? নাকি তুমি জোর করে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছ?

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়।

অবিনাশবাবুর কথা মতো আমি সপ্তাহে দু'দিন ওঁর বাড়ি যাই। উনি আমাকে আর চন্দ্রিমাকে পড়ান, কোশ্চেনের উত্তর লিখি। অবিনাশবাবু সঙ্গে সঙ্গে সেসব পড়ে ভুল-ভ্রান্তি-ঘাটতি দেখিয়ে দেন। বাড়িতেও একবেলা পড়ি, অন্য বেলা শুধু লিখি। হঠাৎ খেয়াল হয়, পরীক্ষার আর তিন মাস বাকি।

এদিকে রাঙাদা পর পর দু'সপ্তাহ কলকাতা গেলেন দিদির বিয়ের ব্যাপারে সবকিছু ঠিকঠাক করতে। দ্বিতীয়বার কলকাতা থেকে ঘুরে আসার পরই ও আমাদের বলল, সামনের চোদ্দই অগাস্ট খুকীর বিয়ের দিন ঠিক করে এলাম। মিতু-শুভদীপকেও খবরটা পাঠিয়ে দিলাম।

রাঙাবৌদি জিজ্ঞেস করে, ওরা খুকীর বিয়েতে আসবে কী?

—খুকীর বিয়েতে আসবে বলেই তো ওরা এতদিন আসেনি।

এবার রাঙাদা রাঙাবৌদিকে বলে, খুকী বলেছে, তোমাকে সামনের শনিবার ভাগীরথী এক্সপ্রেসে পাঠিয়ে দিতে ; আবার রবিবার ঐ ট্রেনেই ফিরে আসবে।

—এখানে তোমাদের কী হবে?

—বিশুকে বলব, ওর বউ যেন আমাদের খাবার-দাবার পাঠিয়ে দেয়।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে।

—আমি বুবুনের পাঞ্জাবি তৈরি করতে দিয়ে এসেছি। তুমি আর খুকী শাড়ি-টাড়ি কিনে ফেলবে।

এইসব কথা শুনে কলকাতা যেতে খুব ইচ্ছে করে কিন্তু পরীক্ষার কথা চিন্তা করে একটি দিনও নষ্ট করতে সাহস হয় না। শুধু কি তাই? এখন আমি রাত সাড়ে ন'টা-দশটার মধ্যেই খেয়ে নেবার পর একটু বিশ্রাম করেই আবার পড়তে বসি। একটা-দেড়টার আগে কোনদিনই শুতে যাই না। রাঙাবৌদি ঘুমিয়ে পড়ে ; হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলেই জিজ্ঞেস করে, পাপাই ক'টা বাজে?

—দেড়টা।

—শোবে না?

—একটু পরে।

—খুব বেশি দেরি করো না।

—না, না, বেশি দেরি করব না। তুমি ঘুমোও।

রাঙাবৌদি আর কিছু না বলে পাশ ফিরে শোয়। আমি এক মনে পড়ি। হঠাৎ ঘড়ি দেখেই চমকে উঠি—পৌনে তিনটে। না, না, আর দেরি করি না ; শুতে যাই। ঘুমের ঘোরেই রাঙাবৌদি আমাকে কাছে টানতেই যেন আমার সব ক্লান্তি চলে যায়। আমি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি।

তারপর?

অ্যাডমিট কার্ড হাতে পেতেই যেন মনের মধ্যে সাইরেন বেজে ওঠে। কে যেন আমাকে হুকুম করে, আর দেরি নেই ; গেট রেডি।

পরীক্ষা শুরু হবার আগের দিন সন্ধের পর দিদি এসে হাজির হয় ; সঙ্গে নিয়ে এসেছে মা আর ছোট পিসীর দেওয়া নির্মাল্য আর বুবুনদার ছোট্ট একটা চিরকুট—পাপাই, তুমি নিশ্চয়ই এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে। আমার

প্রাণভরা শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ রইল। পরেরদিন সকালে রাঙাবৌদি আমার কপালে দিল চন্দন আর দইয়ের ফোঁটা ; রাঙাদা আর দিদি আমাকে পৌঁছে দিল পরীক্ষা কেন্দ্রে। বেশ ভাল পরীক্ষা দিলাম। হাসি মুখেই পরীক্ষার হল থেকে বেরুলাম। রাঙাদা আর দিদি জিজ্ঞেস করল, পরীক্ষা কেমন হলো?

আমি এক গাল হেসে বলি, খুব ভাল। ভাবিনি, এত ভাল হবে।

দিদি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই সন্ধের ট্রেনে কলকাতা ফিরে গেল।

হাজার হোক অনার্সের পরীক্ষা ; দেখতে দেখতেই পরীক্ষা শেষ হলো। একটা পেপারে শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়নি ; তবে সব মিলিয়ে মনে হলো, নিশ্চয়ই অনার্স পাবো। আমার আনন্দ দেখে কে? সেদিন রাত্রে আমি আর রাঙাবৌদি কত হাসি, কত গল্প, কত আনন্দ করি।

পরের দিনই বাড়ি যাই। মেতে উঠি দিদির বিয়ের কাজকর্মে। দু'দিন পরই রাঙাদা-রাঙাবৌদি এসে হাজির। তিন দিন পর ওরা ফিরে যায়। তারপর আসে বিয়ের তিন দিন আগে। সেদিনই সন্ধের পর ছোড়দি-শুভদীপদার আগমন। উঃ! সে কি আনন্দ! ওদিকে বুবুনদার বাড়িতেও হৈ হৈ ব্যাপার। ওর বোন-ভগ্নীপতিরা ছাড়া এক দল মেতে উঠেছে বিয়ের কাজে আর আনন্দে।

দিদির বিয়ের ব্যাপারে রাঙাদা প্রযোজক-পরিচালক-সুরকার হলেও আমি আর শুভদীপদা প্রাণভরে মাতব্বরী করি। পরের দিন দিদিকে দেখেই অবাক হই। ঐ অসামান্য স্নিগ্ধ শান্ত রূপ, দুটি চোখ থেকে স্নেহ-ভালবাসা ঝরে পড়ছে, পরনে সুন্দর সিল্কের শাড়ি, অঙ্গে সোনার নতুন গহনা, সিঁথি আর কপালে রক্তবর্ণ সিঁন্দুর। সব মিলিয়ে ঠিক যেন মা দুর্গা! আমার মনে হয়, বিয়ের পর মেয়েদের সিঁথিতে, কপালে সিঁন্দুর দেখলেই মনে হয় দেবী মূর্তি দেখছি। বৌভাতের দিন বুবুনদার বন্ধুবান্ধবরা খাটতে খাটতে পাগল হয়ে যায় আর আমরা ভি-আই-পি'দের মতো শুধু আনন্দ করি।

ছোড়দি চলে যাবার সময় খুব কাঁদলেও দিদি সামনের বাড়িতেই থাকবে বলে আমাদের কারুরই চোখের জল ফেলতে হলো না।

বৌভাতের পরদিনই বিকেলে রাঙাদা চলে গেল রাণাঘাট। দিদি-বুবুনদার কথা মতো রাঙাবৌদি থেকে গেলেও আমি ওকে নিয়ে ফিরে গেলাম তিন দিন পর। রওনা হবার আগে দিদি আমাকে বলল, পরীক্ষা হয়ে গেছে বলেই কলকাতায় থেকে যাওয়া উচিত না। রাঙাদা-রাঙাবৌদি দু'জনেই তোর জন্য অনেক করেছে। ওরা এভাবে সাহায্য না করলে তোর পড়াশুনা করাই কষ্টকর হতো।

—তা তো বটেই।

—তাছাড়া রাঙাবৌদিকে একলা থাকতে হয়। তুই আছিস বলে ও অন্তত একটু কথাবার্তা গল্পগুজব করতে পারে।

আমি চুপ করে দিদির কথা শুনি।

—রেজাল্ট না বেরুনো পর্যন্ত তুই ওখানেই থাক ; তারপর দেখা যাবে। তবে মাঝে-মধ্যে দু'একদিনের জন্য ঘুরে গেলে তোরও ভাল লাগবে, আমাদেরও ভাল লাগবে।

রাণাঘাট ফিরে যাবার পরদিনই রাঙাদা আমাকে আর রাঙাবৌদিকে জানালো, ওর ব্লাড প্রেসার বেড়েছে ; ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাওয়াও শুরু করেছে। কম নুন খেতে হবে ; তবে চিন্তার কিছু নেই।

আজকাল কলেজ নেই বলে আমিও রাঙাদার সঙ্গে দোকানে যাই ; ক্যাশ সামলাই। রাঙাদার সঙ্গেই দুপুরে বাড়ি আসি। বিকেলের দিকে আমি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি এর-ওর সঙ্গে একটু আড্ডা দিতে। মাঝে মাঝে অবিনাশবাবুর বাড়ি যাই ; চন্দ্রিমার সঙ্গে গল্প করি। কোন কোনদিন চন্দ্রিমাও আমাদের বাড়ি আসে। এরই মধ্যে এক শনিবারে দিদি আর বুবুনদা এসে হাজির। প্রাথমিক আনন্দ উত্তেজনার পর বুবুনদা আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা এসেছি শুধু তোমার জন্য।

আমি অবাক হয়ে বলি, আমার জন্য?

—হ্যাঁ, তোমার জন্য।

*বুবুনদা ব্রীফ কেস থেকে একটা ছাপানো কাগজ বের করে বলে, ইন্ডিয়ান অয়েল* বিভিন্ন জেলার জন্য সেলস প্রমোশন সুপারভাইজার নেবে। নদীয়া-মুর্শিদাবাদের জন্য যে দু'জনকে নেবে, তাদের এই দুটি জেলার কোন কলেজের ছাত্র হতে হবে।

—গ্রাজুয়েট না হলেও নেবে?

—না, গ্রাজুয়েট হওয়া চাই কিন্তু যারা এবছর পরীক্ষা দিয়েছে, তারাও আবেদন করতে পারে। কাজে জয়েন হবার আগে অবশ্যই তাদের পাশ করার প্রমাণ দেখাতে হবে।

এবার দিদি বলে, ইন্ডিয়ান অয়েলের বহু অফিসারের সঙ্গে তোদের বুবুনদার বন্ধুত্ব আছে। তাদের কাছে এই চাকরির খবর পেয়েই আমরা ছুটে এসেছি।

ও একটু থেমে বলে, পরশুই অ্যাপ্লিকেশন করার শেষ দিন।

যাইহোক আমি বুবুনদার নির্দেশ মত ফর্ম ভরি। অবিনাশবাবুকে বলে প্রিন্সিপ্যালের একটা প্রশংসা পত্রও জোগাড় করি। পরদিনই দিদি আর বুবুনদা ফিরে যায়।

সেদিন রাত্রেই রাঙাবৌদি আমাকে বলে, একটা ভবিষ্যত বাণী করব?

—করো।

—এই চাকরি তোমার হবেই।

—কিভাবে বুঝলে?

—আমার মন বলছে।

ও একটু থেমে বলে, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবু আমি বলছি, আমি মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন কিছু মনে করি, যা ভবিষ্যতে সত্যি সত্যি মিলে গেছে।

—যেমন?

—প্রথম উদাহরণ তোমার দাদা।

—রাঙাদা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার রাঙাদা। ওর সঙ্গে কিছুকাল ঘর করার পরই মনে হয়েছিল, কখনই এইরকম নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দে আমার জীবন কাটবে না ; ছন্দপতন হবেই।

আমি চুপ করে থাকি।

—দ্বিতীয় উদাহরণ খুকী। ওকে প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছিল, শুধু এই মেয়েটিই হবে আমার সারাজীবনের পরম প্রিয় বন্ধু। তৃতীয় উদাহরণ তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি।

রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, বি.এ. পড়ার জন্য তুমি যেদিন প্রথম এখানে এলে, সেই দিনই আমার মনে হয়েছিল, এই ছেলেটি নিশ্চয়ই আমার কিছু দুঃখ, কিছু অভাব মেটাবে।

ও না থেমেই বলে, তুমি দেখে নিও, ইন্ডিয়ান অয়েলে তোমার চাকরি হবেই।

—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

—না, না, ফুল-চন্দন চাই না। মাঝে মাঝে আমাকে দেখে গেলেই আমি খুশি হবো।

দিন পনের পরই ইন্টারভিউয়ের চিঠি এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে বুবুনদাকে ফোন করলাম। ও বলল, দু'দিন আগে চলে এসো। আমি বলে দেব, কিভাবে ইন্টারভিউ দিতে হয়।

হ্যাঁ, বুবুনদার কাছে দু'দিন শিক্ষানবীশী করে ঢাকুরিয়া ব্রীজের পাশে ইন্ডিয়ান অয়েলের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান অফিসে গেলাম ইন্টারভিউ দিতে। এক ঘণ্টার রিটন পরীক্ষায় লিখলাম, শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে ইন্ডিয়ান অয়েলের মত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে একটি রচনা। তারপর হলো মৌখিক ইন্টারভিউ। দিন দশেক পরই চিঠি এলো, আই-ও-সি'র ডাক্তারবাবুর কাছে হাজির হবার। ঠিক এক সপ্তাহ পর আবার দিদি আর বুবুনদা এসে হাজির। দিদি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে পাপাই, তোর হয়ে গেছে।

বুবুনদা বলল, কাল ওরা অফিসের নোটিশ বোর্ডে সিলেকটেড ছেলেদের নাম ঝুলিয়ে দিয়েছে খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছিলাম। দিন কয়েকের মধ্যে চিঠি পাবি।

দিদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, তোর রেজাল্টও তো সামনের সপ্তাহেই বেরুচ্ছে।

—হ্যাঁ, কাগজে দেখলাম।

আমি রাঙাদা, রাঙাবৌদি, দিদি আর বুবুনদাকে প্রণাম করি।

রাঙাবৌদি দিদির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, তোমার আদরের ভাইকে জিজ্ঞেস করো, আমি কি বলেছিলাম।

আমি একটু হেসে বলি, জানিস দিদি, আমি অ্যাপ্লিকেশন তোদের দেবার পরই রাঙাবৌদি বলেছিল, এ চাকরি আমার হবেই।

একটু থেমে বলি, রাঙাবৌদির আদর-যত্ন-হাতের রান্না খেয়ে, রাঙাদার প্রশ্রয় আর তোদের দু'জনের ভালবাসার জন্যই...

সবার সামনেই রাঙাবৌদি আমার গালে আলতো করে একটা চড় মেরে হাসতে হাসতেই বলে, থাক! আর ধন্যবাদ জানাতে হবে না। এই মোটা মাইনের চাকরি পেয়ে আমাকে ভুলে না গেলেই যথেষ্ট।

আমিও হাসতে হাসতে বলি, ভগবানকে বলো, আমি যেন নিয়মিত তোমার হাতের চড় খেতে পারি।

আমার সাফল্যে ওদের আনন্দ দেখে আমার প্রাণ-মন ভরে গেল।

পরের সোমবারই রেজাল্ট বেরুল। হ্যাঁ, আমি অনার্স নিয়েই পাশ করলাম। কলেজ থেকেই গেলাম দোকানে; রাঙাদাকে প্রণাম করে খবর দিলাম। বুকে জড়িয়ে ধরেই আদর করলো। ক্যাশ থেকে আড়াই শ' টাকা বের করে বিশুদার হাত দিয়ে বলে, শিগ্‌গির মিষ্টি আনুন। পাপাই আর তোমরা সবাই মিলে খাবে।

সে রাত্রে রাঙাবৌদি উপুড় হয়ে শুয়ে আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলে, আজ স্বীকার করবে তো, আমি তোমাকে কাছে টেনে নিয়ে তোমার কোন ক্ষতি করিনি।

আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বলি, তুমি যে আমার কি উপকার করেছ, তা শুধু আমি জানি। আর কেউ তা জানে না, জানবে না। তুমি আদর-ভালবাসায় আমাকে শুধু সাবালক করো নি, তোমার সান্নিধ্যে আর কথাবার্তায় আমি জীবন সম্পর্কে সচেতনও হয়েছি।

ও আমার কানে কানে ফিস ফিস করে, আজ সাবালক হতে ইচ্ছে করছে নাকি?

আমি দু'হাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলি, একশ' বার ইচ্ছে করছে।

ঠিক তিন দিন পরের কথা।

রাঙাদা জলখাবার খেয়ে দোকানে যাবার ঘণ্টা দেড়েক পরই অবিরাম কলিং বেল বেজে ওঠে। আমি আর রাঙাবৌদি ছুটে যাই দরজা খুলতে। দরজা খুলতেই

বিশুদা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলে, বৌদি, আপনি আর পাপাই শিগ্‌গির দোকানে চলুন। আমি রিক্সা নিয়ে এসেছি।

রাঙাবৌদি চিৎকার করে বলে, কেন? কী হয়েছে?

বিশুদা লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠেই চিৎকার করে বলে, এক মিনিটও দেরি করবেন না।

আমরা কোনমতে সব দরজা বন্ধ করেই রওনা হই। দোকানের সামনে কয়েক শ' লোকের ভিড় দেখেই আমাদের বুকের মধ্যে যেন বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে। আমাদের দেখেই রব ওঠে, এসে গেছেন! এসে গেছেন!

দোকানের মধ্যে পা দিয়েই রাঙাবৌদি উন্মাদের মত চিৎকার করে, ভগবান! একি সর্বনাশ করলে!

আমি পাগলের মত কেঁদে উঠেই চিৎকার করি, রাঙাদা!

সেই মর্মান্তিক বেদনার স্মৃতি আমি ভুলিনি, ভুলব না। সেই স্মৃতির কথা মনে হলেই আমার চোখের জল গড়িয়ে পড়ে ; কিছুতেই আটকাতে পারি না। বুবুনদা কার কাছ থেকে খবর পেয়েছিল, তা জানি না কিন্তু গাড়ি করে চারটের মধ্যেই দিদি, মা, বাবা আর ছোট পিসীকে নিয়ে হাজির। মা রাঙাদাকে দেখেই হা ভগবান বলেই ধপাস করে পড়ে গিয়েই জ্ঞান হারালেন ; 'একি সর্বনাশ হলো' বলেই ছোট পিসীও ধপাস করে বসে পড়লেন ; বাবা চিৎকার করে উঠলেন, রাঙা, তুই একি করলি? মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাবা ছিটকে বেরিয়ে গেলেন বাইরে ; দিদি উন্মাদিনীর মত লুটিয়ে পড়ল রাঙাদার বুকে। প্রাণহীন নিশ্চল পাষাণ মূর্তির মত রাঙাবৌদি শুধু চোখের জল ফেলতে ফেলতে সবকিছু দেখলেন।

তারপর?

তারপর আর কি? নির্মম উদাসীন সময় আপনমনে এগিয়ে চলে। সূর্য ওঠে, অস্ত যায়। পাখিরা যথারীতি মহানন্দে আকাশের বুকে উড়ে বেড়ায়। আশেপাশের মানুষের দৈনন্দিন জীবন চলে একই নিয়মে, একই গতিতে। দিঘির পাড়ে বকুল গাছে বসে মাঝে মাঝে কোকিলও ডাকে তার প্রেয়সীকে। শুক্ল পক্ষের চাঁদ পূর্ণিমায় পূর্ণ যৌবনা হবার জন্য এগিয়ে চলে। এরপর একদিন পূর্ণিমার আলো সর্বত্রগামী হলেও যেন থমকে দাঁড়ায় আমাদের বাড়ির সামনে।

একদিন বুবুনদা আমার মা-বাবা-ছোট পিসীকে নিয়ে চলে যায়। এক সপ্তাহ পর বুবুনদা আবার আসে দিদিকে নিয়ে যাবার জন্য। ওরা রওনা হবার আগে রাঙাবৌদি বলে, বুবুনদা, তুমি মাস খানেক পর দু'চার দিনের জন্য একবার এসো। তোমাকে আমার খুব জরুরী দরকার।

—হ্যাঁ, রাঙাবৌদি, নিশ্চয়ই আসব।

এবার রাঙাবৌদি দিদির দিকে তাকিয়ে বলে, খুকী, পাপাইকে তো সামনের

সোমবারই কৃষ্ণনগর অফিসে জয়েন করতে হবে।

—হ্যাঁ।

—ও আরো কয়েকদিন আমার কাছে থাক। ও দিন কয়েক এখান থেকেই কৃষ্ণনগর যাতায়াত করবে। তারপর ও কৃষ্ণনগরেই থাকবে।

—পাপাইকে যত দিন ইচ্ছে রেখে দাও। এখান থেকে কৃষ্ণনগর তো মোটে আধ ঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ।

—না, ভাই, ওকেও আমি বেশি দিন আটকে রাখতে চাই না। একটু দরকার আছে বলেই আমি কিছুদিন ওকে রেখে দিচ্ছি।

ও একটু থেমে বলে, খুকী, সময় পেলেই তুমি আর বুবুনদা চলে এসো।

দিদি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, হ্যাঁ, রাঙাবৌদি নিশ্চয়ই আসব।

পরের দিন সকালেই রাঙাবৌদির কথা মতো আমি বাজার থেকে বাজার সমিতির সভাপতি মাধববাবুকে ডেকে আনি।

রাঙাবৌদি ওকে বলেন, দাদা, আমার স্বামী আপনাকে ঠিক নিজের বড় ভাইয়ের মতই শ্রদ্ধা করতেন, বিশ্বাস করতেন।

—হ্যাঁ, বৌমা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

—এখন আপনি ছাড়া কেউ নেই যার সঙ্গে দোকানের ব্যাপারে পরামর্শ করতে পারি।

—বৌমা, তুমি শুধু আমার ভ্রাতৃবধূ না, তুমি আমার মেয়ের বয়সী। আমি আমার বুদ্ধি মতো নিশ্চয়ই সৎ পরামর্শ দেব।

—দাদা, আপনি তো স্বীকার করবেন, আমার দ্বারা ব্যবসা চালানো সম্ভব না।

—হ্যাঁ, সত্যি খুব কঠিন ব্যাপার কিন্তু তুমি কী দোকান বিক্রি করতে চাও?

—বিক্রির ব্যাপারে আমি চাই, আমাদের কর্মচারীরাই দোকান চালাক। আমি দোকান ঘর ও জমির জন্য কোন টাকা চাই না। ওরা সবাই মিলে অথবা একজন-দু'জন দোকানের পুরো স্টকের দাম আমাকে দিক। আমি আর কিছু চাই না।

—বৌমা, এ প্রস্তাব তো ওদের লুফে নেওয়া উচিত। এখন জমি সমেত ঐ দোকান ঘরের দামই হবে লাখ পাঁচেক।...

রাঙাবৌদি একটু হেসে বলে, দাদা, কর্মচারীদের তো আমি পর মনে করি না। ওরা দোকান চালিয়ে ভাল থাকলে আমার ভালই লাগবে।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলে, তবে দাদা আমার একমাত্র শর্ত হচ্ছে কোন কর্মচারীকে ছাটাই করাও চলবে না, মাইনে-টাইনেও কমানো চলবে না।

—ঠিক আছে। আমাকে একটু সময় দাও ওদের সঙ্গে কথা বলার।

—হ্যাঁ, দাদা, কথা বলুন কিন্তু সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আমি যাহোক একটা কিছু

ফাইন্যাল করতে চাই।

—সে তো করতেই হবে। এসব ব্যাপার তো মাসের পর মাস ফেলে রাখা যায় না।

—আরো একটা ব্যাপারে আপনাকে কষ্ট দেব।

—কষ্টের আবার কি! বলো, কি করতে হবে।

—সেই সর্বনাশের দিন থেকেই দোকান বন্ধ আছে। ভাবছি, আজ বিকেলে পাপাইকে পাঠাবো দোকান থেকে সব কাগজপত্র আর টাকাকড়ি আনার জন্য...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঠাও। কোন চিন্তা নেই। তোমাদের কর্মচারীদের এখনই খবর দিচ্ছি। তাছাড়া আমি নিজেও থাকব।

মাধববাবু উঠতে উঠতে বলেন, জগদীশ তো ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স, ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদির সবকিছুই দোকানে রাখতো। ওগুলো তো আর ওখানে রাখা চলতে পারে না।

আমি সন্ধের দিকে মাধববাবুর গাড়িতেই দোকান থেকে সব কাগজপত্র আর টাকাকড়ি নিয়ে বাড়ি আসি। রাঙাবৌদি বলল, পাপাই, তুমি টাকাগুলো গুণে আমার আলমারীর লকারে রেখে দাও।

হ্যাঁ, টাকা গুণে বাইশ হাজার তিন শ' ছ' টাকা পঁচাত্তর পয়সা আমি ওর লকারে রেখে দিই।

পরের দু'দিন আমি, বিশুদা আর রাঙাদার ইনকাম ট্যাক্স ল ইয়ার ত্রিদিববাবু কাগজপত্র দেখেশুনে আলাদা করি। বাড়ি আর দোকানের দলিল-টলিল ছাড়াও পাওয়া গেল তিনটে ইন্সিওরেন্সের পলিসি। এক লাখ টাকার পলিসিটি রাঙাবৌদির নামে আর পঁচিশ হাজার টাকার দুটি পলিসি ; তার একটি আমার মা'র নামে, অন্যটি ছোট পিসীর জন্য।

রাঙাবৌদি একটু ম্লান হেসে বলে, দেখছ তো পাপাই, কর্তব্যে তোমার দাদার কোন ত্রুটি ছিল না। সে শুধু আমার কথা মনে রাখে নি, মায়ের মত মামী ও মাসীকেও মনে রেখেছে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, রাঙাদা ওয়াজ রাঙাদা!

পরের সোমবার আমি কর্মজীবন শুরু করলাম।

দিন দশেক পরই রাঙাবৌদি আমাকে বলল, এবার তোমার সুবিধে মতো কৃষ্ণনগরে চলে যাও। আর এখান থেকে যাতায়াত করতে হবে না।

আমি ভাবিনি, রাঙাবৌদি আমাকে এত তাড়াতড়ি চলে যেতে বলবে ; তবু আমি কোন প্রশ্ন করলাম না। বললাম, অফিসেই একটা ঘর আছে আমার জন্য। ফার্নিচারও আছে। তবে একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে যদি রবিবার যাই, তাতে কী তোমার অসুবিধে হবে?

—না, না, কোন অসুবিধে হবে না। তুমি রবিবারেই যেও।

ও কি ভাবছে, কি করবে, কিভাবে একলা থাকবে, তা জানি না, জানতে চাইলামও না। এর মধ্যে শুধু এইটুকু জেনেছি, বিশুদা আর অধীরদা পুরো স্টক কিনে নিয়ে বৌদির শর্তে দোকান চালাতে রাজি হয়েছেন। আর জানি, দোকানে দু'লাখ বাযট্টি হাজার সাত শ' পঁচাত্তর টাকার স্টক আছে। ওদের হয়ে মাধববাবু পুরো টাকাটা রাঙাবৌদিকে দিয়ে দেবেন আর সে টাকা ওরা দু'জনে শোধ করবে এক বছরে।

যাইহোক আমি কৃষ্ণনগর অফিসের একটা ঘরে থাকার জন্য বিধিব্যবস্থা শেষ করে রবিবার সকালে এখান থেকে রওনা হবার আগে রাঙাবৌদিকে বলি, আমি যাচ্ছি। যখনই দরকার হবে কাউকে দিয়ে আমার অফিসে একটা টেলিফোন করে খবর দিও।

—হ্যাঁ, দেব।

রাঙাবৌদি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, পাপাই, তোমাকে একটা কথা বলছি।

—হ্যাঁ, বলো।

—মানুষ বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা যায়, তাকে ঠকানো যায়, তার উপর রাগ করা যায় কিন্তু যে চলে গেছে চিরদিনের মত, তার সঙ্গে কি করে লুকোচুরি খেলব, কি করে তাকে ঠকাবো? তার উপর তো রাগ করেও লাভ নেই।

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এখন তো ওসব কিছু করলে নিজেকেই ঠকাতে হবে, নিজের উপরই রাগ করতে হবে। তাইতো তোমাকে এখান থেকে যেতে বললাম।

আমি অবাক হই ওর এই বিস্ময়কর আত্মোপলব্ধি দেখে।

—তবে খবর দিলে নিশ্চয়ই এসো।

—হ্যাঁ, আসব।

আমি ওকে প্রণাম করতেই আমার চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। রাঙাবৌদি দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে আমার কপালে একটা চুমু খেয়ে বলে, তোমার কল্যাণ হোক।

ও আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতেই আমি রিক্সায় উঠে পড়ি।

একদিন না, দু'দিন না, এক মাস-দু'মাসও না, প্রায় পাঁচ মাস পরে একদিন বেশ রাত্রে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলেই বলি, হ্যালো!

—কে পাপাই?

—হ্যাঁ, রাঙাবৌদি আমি ; তুমি এত রাত্রে কোথা থেকে ফোন করছো?

—বাড়ি থেকেই ; বাড়িতেই টেলিফোন নিয়েছি।

মনে মনে বলি, এখন তো তুমি লাখ লাখ টাকার মালিক। নিশ্চয়ই খুব মজা

করছো। সুতরাং টেলিফোন নেবে না কেন?

—রাঙাবৌদি, তুমি কেমন আছো?

—ভাল, তুমি ভাল আছো তো?

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, অবশ্য তোমার খবর জানতে পারি খুকী আর বুবুনদার কাছে।

—ওরা মাঝে মাঝে আসে নাকি?

—হ্যাঁ। তুমি শনিবার দুপুরেই এসো। আবার সোমবার ফিরে যেও।

—কী ব্যাপার?

—এসো ; সব জানতে পারবে।

—দুটো পর্যন্ত অফিস করে তিনটে-সাড়ে তিনটের মধ্যে পৌঁছব।

—ঠিক আছে। তুমি এলে খুব খুশি হবো।

শনিবার।

গলিব মধ্যে একটু এগুতেই কানে আসে—

রোদনভরা এ বসন্ত,
সখী, কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহ বেদনা রাঙানো
কিংশুক রক্তিম রাগে...

হঠাৎ বুবুনদা এগিয়ে এসে বলে, পাপাই, যে রাঙাবৌদিকে তুমি চিনতে, সে মরে গেছে। রাঙাদার মৃত্যুর পর এক নতুন রাঙাবৌদির জন্ম হয়েছে। নিজের সর্বস্ব কিছু দিয়ে জগদীশ স্মৃতি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে গত মাসে। আগামীকাল আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

আবার গানের সুর ভেসে আসতেই ও বলে, উদ্বোধনের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্গদা হবে। তাই রাঙাবৌদি ওর নাচের ক্লাশের মেয়েদের নিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছে।

অন্ধকার ভেদ করে যেমন সূর্যদেব আত্মপ্রকাশ করেন, সেইরকম মানুষের জীবনে চরম দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, মহাদুর্যোগেই তার আসল সত্ত্বা প্রকাশ পায়। রাঙাবৌদি তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আবার কানে আসে—

রোদনভরা এ বসন্ত,
সখী, কখনো আসে নি বুঝি আগে...